জলযাত্রা

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

জলযাত্রা

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৭

— কুড়ি টাকা —

প্রচ্ছদপটের ত্রিবর্ণ চিত্র ও
গ্রন্থের ভিতরের নৌকা ও বজরার রেখাচিত্র
৺ইন্দ্র দুগার কর্তৃক অঙ্কিত

●

গ্রন্থের ভিতরে কাশীর বিভিন্ন ঘাটের চিত্র
শ্রীসমীর বিশ্বাস কর্তৃক অঙ্কিত

●

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা
শ্রীপূর্ণেন্দু রায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা : লি :, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ ১৫২, মানিকতলা মেন রোড,
কলিকাতা - ৭০০ ০৫৪ হইতে মুদ্রিত

প্রকাশকের নিবেদন

এই গ্রন্থের লেখক শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একদা কাশীবাস কালে গঙ্গার ওপর বজরায় বেশ কয়েকদিন কাটাবার সুযোগ পান। সুযোগটি ঘটনাচক্রেই জুটে যায় একথা বললেই ঠিক হয়। গঙ্গার ওপর এই বজরা বাসের এক চিত্তাকর্ষক বিবরণ 'গঙ্গাবক্ষে' নাম দিয়ে 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বজরায় মালিকের সঙ্গে পরিচয়সূত্রে পরে সেই বজরাতেই কাশী থেকে প্রয়াগ যাত্রার এক সুবর্ণ সুযোগ আসে। লেখক সে সুযোগ হারান না। লেখকের বহু দুর্গম অজানা অঞ্চলে ভ্রমণের সঙ্গী শেষকিরণ সুরানাকে নিয়ে তিনি বজরায় গঙ্গার স্রোতধারার উজানে কাশী থেকে প্রয়াগ রওনা হন। বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা উত্তেজনা আতঙ্ক বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে অবশেষে বজরা পৌছায় প্রয়াগে। গঙ্গাবক্ষে বজরায় বাস এবং বজরায় কাশী থেকে প্রয়াগের ভ্রমণ-বিবরণ—এই দুটি মিলিয়েই প্রস্তুত হয়েছে 'জলযাত্রা' গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি প্রকাশের ফলে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের পাঠকদের কাছে এক সম্পূর্ণ নূতন ও বিচিত্র ভ্রমণকথা আস্বাদনের সুযোগ ঘটেছে।

গঙ্গার উজানে
বারাণসী থেকে এলাহাবাদ

এলাহাবাদ
গঙ্গা
ত্রিবেণী
যমুনা
লচ্ছাগীর
সিরসা
টন্স নদী
গোপীগঞ্জ
মির্জাপুর
বর্ণা নদী
বারাণসী
রামনগর
ডুমার
জিরগো নদী

জলযাত্রা

প্রয়াগ ঘাট

প্রয়াগ-কুম্ভে হাতীর পিঠে সাধুদের শোভাযাত্রা

কুম্ভমেলার তাঁবু

প্রয়াগ-সঙ্গমে যাত্রা

প্রয়াগে কুম্ভমেলা
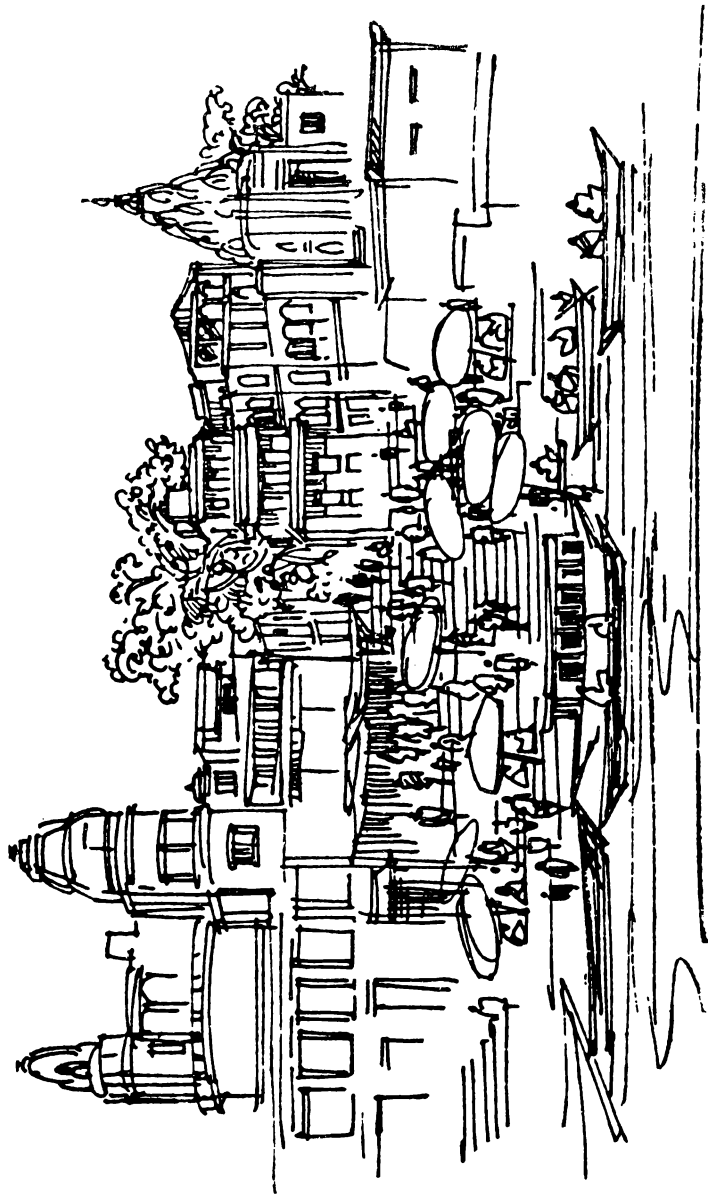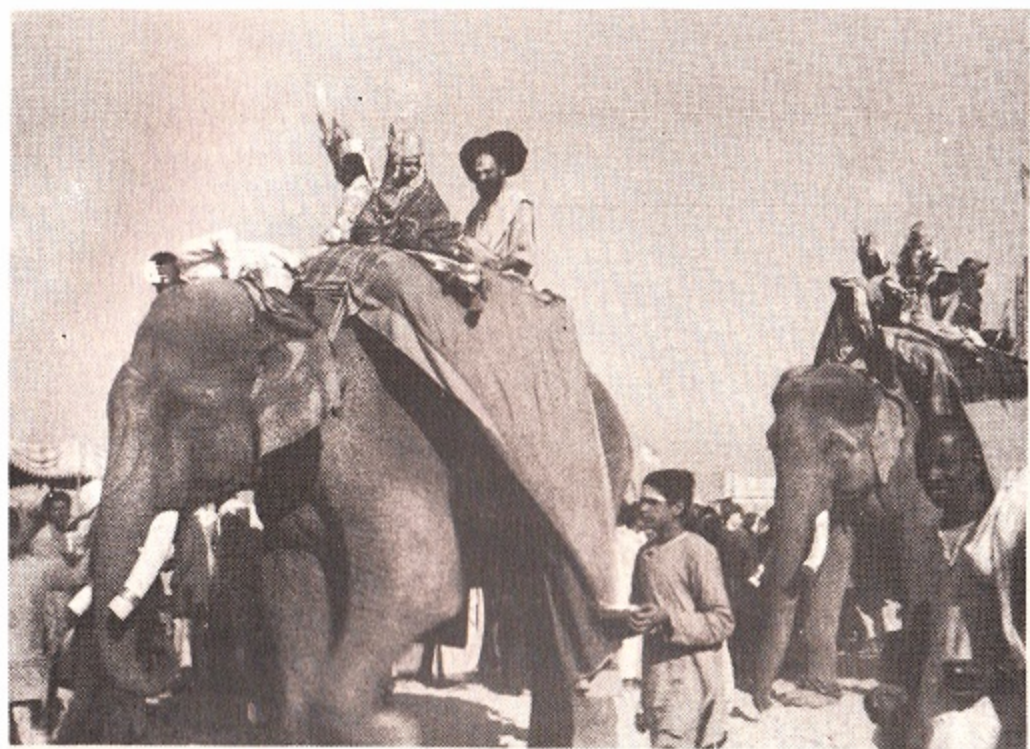
॥ এক ॥

সেই ছেলেবেলা থেকে শুরু করে কাশীতে কতোবার এসেছি। আমোদে-আহ্লাদে মনের আনন্দে হইচই করে কতোদিন কেটেছে। কিন্তু, সে-বছর এসে যে এমন অভূতপূর্ব কাশীবাসের অভিজ্ঞতা লাভ হবে, স্বপ্নেও ভাবি নি।

এক বন্ধুর সঙ্গে তাঁরই বাড়িতে উঠেছি। গঙ্গার ঘাট থেকে অল্প দূরে। বাঙালীটোলার সেই জট-পাকানো গলির মধ্যে। কোথা দিয়ে ঘুরে ঘুরে বাড়ির দরজায় আসি মনে থাকে না। গোলকধাঁধার মত লাগে। তারপর দেখি, গলিপথেরও ধর্ম আছে। যে-দিকে যাব সেই দিক লক্ষ্য রেখে এগিয়ে গেলে এক সময় ঠিক বড় রাস্তায় এসে পৌঁছুব। সব নদীর জল অবশেষে যেমন সাগরজলে মেশে। পথে যেতে শুধু নজর রাখা তু'একটা চিহ্ন,—কোন্ জায়গায় বন্ধুর বাড়ির গলিটা বেঁকে ঘুরে গেছে।

তিনতলা পুরানো বাড়ি। একতলায় এক ভাড়াটিয়া পরিবার থাকেন। দোতলা ও তিনতলা বন্ধু নিজেদের ব্যবহারের জন্য বন্ধ রাখেন। ছুটি হলে নিজে এসে কিছুদিন কাটিয়ে যান। কখনো বা আত্মীয়স্বজনও আসেন।

আমরা তুজনে সে-বছর এসে রয়েছি তিনতলায়। তিনখানা ঘর। পাশেই ছাদ। পরম আনন্দে ও শান্তিতে দিন কাটে।

বন্ধু নিত্য গঙ্গাস্নান করেন, বিশ্বনাথ দর্শনে যান, বাজার করে আনেন। আর আমি নিয়েছি রান্নার ভার। তিনতলা থেকে নামি না। ছাদে বেড়াই। বন্ধু থাকেন ধর্মগ্রন্থপাঠে মগ্ন, তাঁর নিজের মতন, তাঁর ঘরে। আর আমিও থাকি স্বতন্ত্র, আর এক ঘরে, আমার নিজের মতন।

স্নানে যাবার সময় বন্ধু মাঝে মাঝে পীড়াপীড়ি করেন, চল হে চল,—একদিন গঙ্গাস্নানটাও করবে চল।—আমি বলি, বেশ আছি। ছাত থেকে গঙ্গাদর্শন হচ্ছে। মা যখন আরও কাছে টানবেন, তখনি যাব।

কথাগুলি বলি বটে, কিন্তু তখন কি আর জানি, কদিন পরে মা গঙ্গা কী ভাবে পালিয়ে-বেড়ানো দুরন্ত ছেলেকে টেনে নিয়ে তাঁরই কোলে স্থান দেবেন!

একদিন বন্ধু জানান, ওহে! এই পড়, ভাইঝির চিঠি। তার খুড়-শ্বশুর সপরিবারে দিন পনেরোর জন্যে এখানে আসতে চান। দোতলাতে চারখানা ঘরই তো খালি পড়ে আছে, তাই ভাইঝি জানতে চেয়েছে সেখানে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব কি না। কি উত্তর দেব, বল।

বলি, লিখবে—আসবার জন্যে। ঘর খালি পড়ে রয়েছে, তোমার কুটুম্বরা আসতে চান,—এতে ভাববার কি আছে?

সেইমত চিঠির উত্তর যায়। কদিন পরে খবরও আসে, তাঁরা কোন্ তারিখে পৌঁছুবেন।

বন্ধুকে তখন জানাই, আমি কিন্তু তাঁদের আসার আগের দিনই এলাহাবাদ যাব।

বন্ধু শুনে অবাক,—সে কী কথা! তুমিই তো বললে তাঁদের লিখে জানাতে তাঁদের আসবার জন্যে! তাঁরা থাকবেন দোতলায়,—আমরা দুজনে রয়েছি তিনতলায়। আমাদের সব কিছু ব্যবস্থাও ওপরেই রয়েছে। আর তুমি তো তিনতলা থেকে নামোই না। ব্যাপার কি বুঝলাম না। তবুও, তোমার যদি কোনও অসুবিধে মনে হয়, এখনি টেলিগ্রাম করে তাঁদের আসতে নিষেধ করে দিই। তোমার অন্য কোথাও যাওয়া চলবেই না,—এলাহাবাদ যাওয়ার কথা তো তোমার এখন নয়, আরও কিছুদিন পরে।

আমি বলি, সবই ঠিক কথা। অসুবিধা আমার হবার কথা নয়,

জানি। তবুও হবে। তাঁরা এলে, এ বাড়িতে আমার পক্ষে এভাবে একান্তে থাকা সম্ভব হবে না। তাঁরা ওপরে আসবেনই, গল্পগুজবও আমাকে চালাতে হবে। ছুটি কাটাতে তাঁদের আসা,—এভাবে ওপরে এসে গল্প করে সময় কাটানোয় তাঁদের কোন অন্যায় নয়, স্বাভাবিকই। কিন্তু, তুমি তো আমার প্রকৃতি জান,—আমি থাকতে চাই একা,—চুপচাপ,—সে কথা তো তাঁদের বলা যায় না। আবার, নীচের ঘরগুলি খালি পড়ে রয়েছে, কুটুম্ব আসতে চান, একজন মাত্র লোক বাড়ির তিনতলায় রয়েছে বলে অপর তলাতেও কেউ এসে থাকতে পারবে না,—এ কথার মর্মও তো কাউকে বোঝানো যায় না। লোকে ভাববে, সেই dog in the manger পলিসি!—এইসব ভেবেই বলেছিলাম তাঁদের আসবার কথা লিখে দিতে। কদিন পরে না হয়ে আমি এখন আগেই এলাহাবাদে যাই, পরে আবার এখানে এলেই হবে।

বন্ধুকে অনেক করে বোঝাই, রাজীও করাই।

পরদিন কাশীবাসী বন্ধুদের কাছে বিদায় জানাতে বার হই। হঠাৎ এক মহাত্মা যোগী পুরুষের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায়।

আলাপের প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন, কতোদিন থাকা হবে এবার কাশীতে?

খোলাখুলি সব কথাই তাঁকে বলি।

তিনি তখনি বলেন, সে কী? নিরিবিলি একা থাকতে চান,—এ তো খুব ভাল কথা। এখনি তার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে। কাশীর নরেশের প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি এখন খালি পড়ে আছে—যেখানে সেবার ক্রুশ্চেভ্ এসে ছিলেন,—ত্রিসীমানায় তার লোকজন থাকে না,—সেইখানে থাকবেন? ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

আমি বলি, রাজারাজড়ার প্রাসাদে বাস,—আমার পক্ষে স্বস্তিকর হবে না।

শুনে তিনি হাসেন। বলেন, আচ্ছা, বেশ! বুঝেছি আপনার মনো-

কাশীর গঙ্গায় বজরা
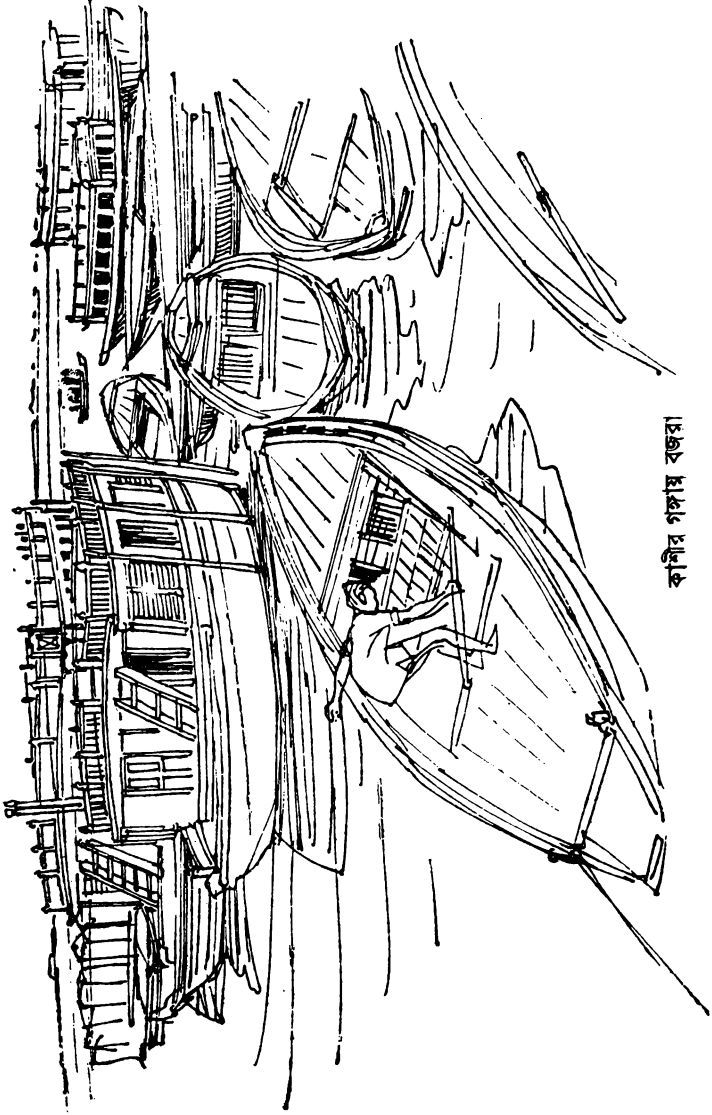
ভাব। গঙ্গার উপরে নৌকায় থাকবেন?

নৌকায়! শোনামাত্রই পুলকে দেহে শিহরণ জাগে। সোৎসাহে জানাই, এখনি রাজি।

সব ব্যবস্থাও তখনি হয়ে যায়। বন্ধুর সম্মতি নিয়ে পরদিনই নৌকায় এসে উঠি।

আমার সামান্য জিনিসপত্রগুলি ঝোলায় পুরে কাঁধে ঝুলিয়ে যখন গঙ্গার ঘাটে এসে দাঁড়ালাম তখন বেলা হয়ে গেছে। নদীর অপর পারে সূর্য উঠে গেছেন আকাশপথে কিছু উপরে। গঙ্গার জলস্রোতে তারই কিরণপাতে যেন অজস্র হীরকখণ্ড ঝিক্‌মিক্ করে। দেখে মনে হয়, স্নেহ-ময়ী জননীর চোখে হর্ষোৎফুল্ল চাহনি,—মুখে না-বলা বাণী,—এবার এলি আমার কোলে!

ঘাটে বাঁধা আমার নৌকা। নৌকা নয়,—বজরা। কিন্তু, তীর থেকে অল্প দূরে। বজরা ও পাড়ের মাঝে ভাসে দুটো নৌকা। ডাঙা থেকে তারই উপর পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে বজরায় উঠি। হঠাৎ ভার পেয়ে বজরা দুলে ওঠে। মাঝি হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরে। দৃঢ় মুষ্টিতে যেন তার সাদর স্বাগত সম্ভাষণ!

পাড়ে দাঁড়িয়েই দেখেছি, গঙ্গা থেকে বালতি ভরা জল তুলে বজরার সারা অঙ্গ সে অতি যত্নভরে ধোয়ামোছা করছিল। মুগ্ধ হয়েছিলাম তার এই, হয়ত নিত্যকৃত্য, কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখে। যেন, সামান্য একটা বজরা নয়—মন্দিরে বিগ্রহকে স্নান করানো।

তাই, সেই ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে সদ্যধৌত বজরায় উঠে দাঁড়িয়েই বলি, বাঃ! কী সুন্দর তোমার বজরাখানি। কতো যত্ন করে ধুচ্ছিলে!

শুভ্র দন্তপঙ্‌ক্তি প্রকাশ করে সরল হাসির ছটায় দীপ্তিভরা মুখে বলে, করবো না তো কী বাবুজি ? এই তো আমার অন্নদাতা, জীওনদেওতা !

"বজরার নাম কি তোমার ?"

"গঙ্গা।"

"বাঃ ! আর তোমার নিজের ?"

চওড়া বুক চিতিয়ে বলে,—"বিশ্বনাথ !"

শুনে আনন্দে মন তখনি ভরে ওঠে। বারাণসীর গঙ্গাবক্ষে নৌকা-বাস। বিশ্বনাথ আমার কর্ণধার। এ কী কখনও কল্পনাও করেছি ?

তরুণ বিশ্বনাথের সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ। তামাটে রঙ্‌। নিপুণ শিল্পীর হাতে যেন পাথর কেটে গড়া সুঠাম মূর্তি। গ্রীক শিল্পকলারই যেন নিদর্শন। পেশীবহুল, অথচ স্নিগ্ধ ছন্দোময় আকৃতি। চওড়া বুক, সরু কোমর। বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ। জানি, কাশীতে কুস্তির আখড়া পল্লীতে পল্লীতে। প্রশংসা করে বলি, চমৎকার শরীরটা তৈরী করেছ বিশ্বনাথ।

সে সলজ্জ হাসে।

বজরার ঘরের মধ্যে ঢুকতেই নজর পড়ে একপাশে রাখা চক্‌চকে কয়টা পিতলের বালতি। সকালের রোদে দেখায় স্বর্ণকান্তি। জিজ্ঞাসা করি, এতগুলো নতুন বালতি কোথা থেকে আনলে ?

সে জানায়, ওগুলো আমারই। প্রতিবছর কাশীর গঙ্গায় বাচ খেলা হয়,—ক'বছরই প্রথম হয়েছি—তারই প্রাইজ্‌। এগুলো এনে রাখলাম,—আপনার জন্যে জল তোলা থাকবে। আপনাকে নিজে যাতে জল তুলতে না হয়।

এই বিশ্বনাথেরই সেবাযত্নে মনের আনন্দে আমার দিন কেটে যায় গঙ্গার বুকে সেই বজরার ভিতর।

বিশ্বনাথ অবশ্য রাত্রে তার বাড়িতে থাকে। দিনের বেলায় মাঝে মাঝে আসে। খোঁজখবর নেয়। বালতিগুলি ভরে জল তুলে রাখে। বজরা-খানি প্রতিদিন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে। তার আরও একটা

বজরা ও তিনটে নৌকা আছে, সেইগুলি ভাড়া খাটায়, তাই নিয়ে সারা-দিন ব্যস্তও থাকে।

আর আমি? বজরা ছেড়ে গঙ্গাতীরে নামি কচিৎই। নামার প্রয়োজনও হয় না, আগ্রহও থাকে না। তবে, এখানে এসে এখন গঙ্গায় নিত্য অবগাহন চলেছে। বজরায় রাখা একটা লম্বা তক্তা আছে, টেনে নিয়ে সেটা পাড়ের সঙ্গে লাগালেই নীচে নামার সেতু হয়ে যায়।

খাওয়া-দাওয়া? নিজের বজরার মধ্যে স্টোভে রান্নার ব্যবস্থা করব, সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু, সেই যোগিবর কোনমতেই স্বতন্ত্র আয়োজন করতে দেন নি। ঘাটের ওপরেই তাঁর আবাস। বলেন, আমরা কি না খেয়ে থাকি? ঐ তো সামনেই আপনার নৌকা বাঁধা। দুবেলাই আপনার খাবার পৌঁছে যাবে।

আমি আপত্তি জানাই, তিনি শোনেন না।

দুবেলা খাবার নিয়মিত পৌঁছাতোও তাই। তাঁরই শিষ্য সেবক কেউ এসে দিয়ে যেতেন,—শুদ্ধ বেশে, নগ্নপদে, থালা হাতে।

আমি অস্বস্তি বোধ করি। তাছাড়া, ঘাটের পথে কতো আবর্জনা থাকে,—ভাঙা কাঁচও। বলি, জুতা পায়ে খাবার নিয়ে এলে আমার কোনই আপত্তি নেই, তবু তাঁরা শোনেন না, এমনি তাঁদের বিশুদ্ধ নিষ্ঠাজ্ঞান, অকুণ্ঠ সেবা।

তবে, কখনো কখনো অতিভোরে নৌকা ছেড়ে আমাকে নামতে হয়। তাঁরা কেউ এসে ডাক দেন, দাদা ডাকছেন।—

যাইও তখনি। নিশাশেষের অস্ফুট আঁধারে। কাটিয়ে আসি তাঁরই জ্যোতির্ময় সান্নিধ্যে দু'এক ঘণ্টা। সময় কাটতো সে যেন কোন্ স্বপ্নসম অমৃতলোকে!

আর, বেড়ানো? পায়চারি করি বজরার ঘরের ছাদের উপর। সকালে, সন্ধ্যায়। কিন্তু, সে পদচারণায় সদ্য হাঁটতে-শেখা শিশুর মত শিখতে হয় নতুন করে পা ফেলে চলা, দেহের ভারসাম্য বজায় রাখা।

নদীতরঙ্গের অবিরাম দোলানিতে নৌকা দোলে সারাক্ষণই। পাশ দিয়ে অপর নৌকা চলাচলে সে আন্দোলন বাড়িয়ে তোলে। নৌকার ঘরের কাঠের পাটাতনের উপর সতরঞ্চির শয্যা পেতে রাত্রে যখন শুই, মনে মনে ভাবতে থাকি, মায়ের কোলে পরম আনন্দে শিশু যেন দোল খায়। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ, শুধু জননী জাহ্নবীর একটানা স্রোতধারার মৃদু মধুর জলধ্বনি,—মায়ের কণ্ঠে ঘুমপাড়ানি গানের মধুময় গুঞ্জন। রাত্রের নিদ্রা,—সেও যেন স্বপ্নলোকে বাস।

সারাক্ষণ নৌকার মধ্যে এই দোলানিতে ঘোরাফেরা, থাকা, এমনি অভ্যস্ত হয়ে যায় যে দীর্ঘ নৌকাবাস ও নৌযাত্রার পর অনুভব করেছি তটে নেমে মাটিতে হেঁটে চলতে কিছুকাল চরণযুগল অস্বস্তি বোধ করে, দেহ টলে। অনবরত নদীস্রোতের কুলুকুলু কলধ্বনি কর্ণকুহর ভেদ করে যেন অন্তরলোকে আসন পেতে দীর্ঘস্থায়ী হয়। নদী ছেড়ে চলে আসার পরও কয়েকদিনই সেই শব্দ অতিচেনা গানের সুরের মত নিয়ত কানে বাজতে থাকে। হিমালয়ে দীর্ঘপদযাত্রার পর শহরে ফিরে এসে ঠিক তেমনি পার্বত্য নদনদী ও ঝরণাধারার নিত্যশোনা জলকল্লোল কানের মধ্যে বহুদিন ধ্বনিত হতে থাকে।

এই সম্পর্কে মনে পড়ে এক সরস ঘটনা।

১৯৩৬ সাল। মাকে নিয়ে চলেছি কাশ্মীরের অমরনাথ তীর্থযাত্রায়। কয়েকজন আত্মীয়া ও মায়ের সুপরিচিতা প্রতিবেশিনীও সঙ্গিনী হয়েছেন। পথে সাহায্যের জন্য তাঁদের একজনের যুবা নাতিও চলেছে। নাম তার অনিল। বাবার এক বন্ধুও সস্ত্রীক দলে যোগ দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা জানান। আমরা তাঁকে কাকাবাবু বলে সম্বোধন করি। বয়সে তাঁরা বৃদ্ধ বৃদ্ধা। কাকাবাবু আবার কানেও কম শোনেন। তাই তাঁকে বলি, সঙ্গে আপনাদের এক ছেলেকেও নিয়ে চলুন দেখাশোনা করার জন্যে। তিনি বলেন, বঙ্কিম সঙ্গে যাবে। সে তো তোমার বন্ধু, স্কুলের সহপাঠী। শুনে আমিও খুশী। আমার আর এক বন্ধু মুটুও খবর পেয়ে এসে যোগ দেয়।

বিরাট দল গড়ে ওঠে। সেকালে কাশ্মীর-শ্রীনগরে যেতে হোত পাঞ্জাবে রাওয়ালপিণ্ডি হয়ে। কলকাতা থেকে সুদীর্ঘ রেলযাত্রা। তিনদিন ট্রেনে কাটিয়ে অবশেষে রাওয়ালপিণ্ডি পৌঁছুই। বিকালবেলা। পরদিন সকালে মোটরে শ্রীনগর রওনা হতে হবে। স্টেশনের অদূরে একটা হোটেলে রাত কাটানোর জন্যে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কয়খানা ঘর পাওয়া গেছে। কাকাবাবুকে তারই একটায় নিয়ে গিয়ে বলি, চমৎকার বিছানা পাতা, আপনি এখন কিছুক্ষণ লম্বা হয়ে শুয়ে বিশ্রাম করুন, পারেন তো একটু ঘুমিয়েও নিন, কদিন ট্রেনে ধকল গেছে কম!—আমরা ততোক্ষণ অন্যসব গোছগাছ ব্যবস্থাদি করি।

তিনি বলামাত্রই তাঁর বিশাল দেহখানি নিয়ে শিশুর মতন তখনই শুয়ে পড়েন।

কিছুক্ষণ পরে ঐ ঘরে ঢুকে দু'একটা মালপত্র রাখতে গেছি, দেখি, তিনি চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছেন।

জিজ্ঞাসা করি, কি হোল? ঘুমোচ্ছেন না কেন?

তিনি গম্ভীর মুখে বলেন, বঙ্কিম কোথায়? ডাক তো বাবা তাকে। সেই সঙ্গে মুটু ও অনিলকেও আসতে বোলো।

আমি চিন্তিত হই। বলি, কী ব্যাপার? শরীর খারাপ লাগছে নাকি?— চেঁচিয়ে তাদের সবাইকে ডাকি।

তারা তখনি আসেও। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে আমরা প্রশ্ন করি,—কি হয়েছে? কোন কষ্ট বোধ হচ্ছে?

তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখেন। তেমনি গম্ভীর স্বরে বলেন, তোমরা চারজনেই এসেছ? এইবার এক একজন খাটের চার কোণের চারটে খুঁটির কাছে গিয়ে দাঁড়াও তো বাবা!

বিস্মিত হয়ে আমরা তখনি সেইভাবে চার কোণে দাঁড়াই। তিনি তখন বলেন, বাবা, এইবার চারজনে খাটটাকে একটু তুলে দোলনার মতন দোল দিতে থাক দিকি। কদিন একটানা ট্রেনের ঝাঁকুনিতে এমনি এখন

অভ্যেস হয়েছে,—দোলানি না খেলে আর ঘুম আসতে চাইছে না, বাবা!

কথা শুনে এতক্ষণে আমরা হেসে লুটোপাটি।

বজরাবাস কালে সেই ঘটনাই মনে পড়ে যায়। সারাক্ষণই নৌকার দোলানি। কখনো কম, কখনো বেশি।

বজরার ছাদে বেড়ানোর সময় নানারকম ঘটনাও ঘটে।

সকালে বিকালে কতো যাত্রীভরা নৌকা ও বজরা পাশ দিয়ে দাঁড় টেনে মাঝিরা বয়ে নিয়ে যায়।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কতো তীর্থযাত্রী, পর্যটক দল! ভিন্ন ভিন্ন তাদের বেশভূষা, কথোপকথনের ভাষাও। কিন্তু, কাশীতে গঙ্গার কোলে যেন সবাই এক মায়ের সন্তান,—এক মন, এক প্রাণ। পাশ দিয়ে যেতে অনেকেই আমার বজরার দিকে তাকিয়ে দেখে।

একদিন তেমনি একটা নৌকায় বাঙালী যাত্রী চলেছেন সপরিবারে। হঠাৎ কানে গেল কয়টি কথা,—আরে! দেখ দেখ, এই বজরাটা! ভেতরে কাপড়-চোপড় ঝুলছে,—কেউ গঙ্গার বুকে নৌকাবাস করছেন,—ছাতের ওপর ঐ বেড়াচ্ছেনও!

কথাগুলি কানে যেতেই নৌকার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাই। চোখাচোখি হয়ে যায়। তিনি তখনি উচ্ছ্বসিত উচ্চ কণ্ঠে বলে ওঠেন, আরে! উমাপ্রসাদ! তুমি এখানে? ধন্য ধন্য—

স্রোতের টানে চলন্ত নৌকা দেখতে দেখতে এগিয়ে যায়। আমিও তারই ফাঁকে চিনতে পেরে তাঁকে দু'হাত জুড়ে প্রফুল্ল মুখে প্রণাম জানাই। নৌকা দূরে চলে যায়।

চোখের সামনে ফুটে ওঠে বহুদিন-বিস্মৃত স্মৃতিচিত্র। চল্লিশ বছরেরও

আগের কথা। সেই কলেজের ছাত্রাবস্থায় আমাদের বাঙলা ক্লাস নিতেন —শিবপণ্ডিত মহাশয়! কতোকাল পরে হঠাৎ এই দেখা! তিনি দেখেই চিনেছেন,—আমি তো চিনবোই।

এইভাবে আরও কয়েকজন অতীত দিনের পরিচিত ও পুরানো বন্ধু-দেরও চকিতের দেখা পেয়ে যাই। সকালের দিকে বিদেশী টুরিস্ট দল নিয়ে বড় বড় বজরা যায়। তাদেরই একদিনের ঘটনা বলি।

সেই বজরার ছাদে চেয়ারে বসে সাহেব, মেমের দল। সঙ্গে এক স্থানীয় গাইড্। ইংরেজিতে বক্তৃতা দিয়ে ঘাটগুলির ইতিহাস বা মাহাত্ম্য শোনাচ্ছে। প্রৌঢ়া এক মেম তার বর্ণিত ঘাটের দিকে সাগ্রহে তাকা-চ্ছেন—একটা নোটবুকে কি সব সোৎসাহে লিখছেনও। পাশে বোধ হয় তাঁর বৃদ্ধ স্বামী। হাতে ক্যামেরা। ছবি তুলছেন। হাবভাবে মনে হয় উৎসাহের অভাব। হয়তো স্ত্রীর আগ্রহেই ভারতভ্রমণ। গাইড্ কাশীর অপর পারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, গঙ্গার ঐদিকের তীরভূমি কিন্তু পবিত্র নয়, তীর্থক্ষেত্রও নয়। লোকের বিশ্বাস, ওপারে লোক মারা গেলে গাধা হয়ে তার জন্ম হয়, আর এপারে মৃত্যুতে স্বর্গলাভ। ঠিক সেই সময়েই এপারে আমার নৌকার ঘাটের নিকটেই গঙ্গার ধারে ধোপাদের একটা গাধা বিকট ডাক ছাড়ল।

মেম তখনি চমকে উঠে সেদিকে ফিরে তাকান, গাইড্কে তৎক্ষণাৎ সাশ্চর্যে প্রশ্ন করেন, Well! Why then that donkey is on this side of the river?—ও-গাধাটা তাহলে এপারে কেন?—বলেই নোটবই-এ কি লিখতে শুরু করলেন। বজরাও এগিয়ে চলে গেল আমার কাছ থেকে দূরে।

সারাদিন কত লোক আসে গঙ্গাস্নানে। সকালে দুপুরে বিকালে। সন্ধ্যার পরও দু'একজন আসেন। গভীর রাতে নিয়মিত এসে স্নান করেন এক সাধু। ঘাট তখন জনশূন্য। নীরব নিস্তব্ধ। যেন সুপ্তিমগ্না নিশীথিনী। আবছা অন্ধকারে ছায়াসম নিঃশব্দে ধীরপদে সেই মূর্তি এসে জলের ধারে

অহল্যাবাই ঘাটে কথকতা
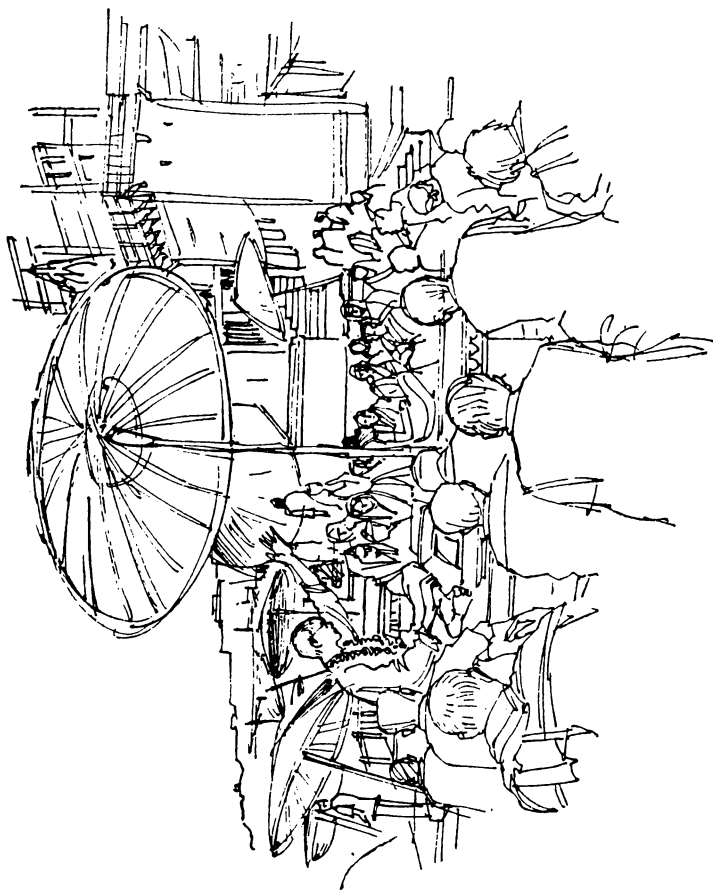
ক্ষণিক দাঁড়ান। সুস্পষ্ট চেহারা দেখা যায় না। তবে, বোঝা যায়, লম্বা জটা, কৌপীন বাস। আর শোনা যায়, গঙ্গাবক্ষে নেমে তাঁর মৃদুকণ্ঠে উচ্চারিত সংস্কৃত স্তোত্র। স্নানান্তে চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ যেন সেই স্তোত্রেই সুর গঙ্গার বুকে, দিগদিগন্তে, আকাশের তারায় তারায়, আমার হৃদয়ের গভীরে অনুরণিত হতে থাকে। অপূর্ব সেই অনুভূতি।

গৈরিকবসনা পূতসলিলা জাহ্নবী। অথচ, দিনের বেলায় গঙ্গার সেই পবিত্র প্রবাহের বুকে মানুষের সৃষ্ট অপকীর্তি দেখে মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। ঘাটের অদূরে নোঙ্‌রা জলের প্রকাণ্ড নালা বীভৎস মুখব্যাদান করে গঙ্গায় পড়েছে। শহরের যতোপ্রকার আবর্জনা, মানুষের মূত্রবিষ্ঠামিশ্রিত ঘোর দুর্গন্ধময় মসীকৃষ্ণ ময়লা জল! সেদিক থেকে বাতাস বইলে নৌকায় তিষ্ঠানোই প্রাণান্তকর। ভাবি, অবোধ শিশু মায়ের কোল নোঙ্‌রা করে, যতোদিন না তার বুদ্ধি ফোটে। কিন্তু, সভ্য মানুষের শহর পরিচালনার এ কী বিচারবুদ্ধিহীন কদর্য বিধিব্যবস্থা! শুধু এই নয়। গঙ্গার স্রোতে যেমন দেখতে পাই ভেসে চলে রাশি রাশি পূজা দেওয়া ফুল, বিল্বপত্র, ফুলের মালা, তেখনি আবার কখনো কখনো দেখা যায়,—মানুষের বা পশুর মৃতদেহ! স্ফীত কুৎসিত আকার। কাকের ঝাঁক তারই উপর বসে ঠুকরে খেতে ব্যস্ত!

মনে পড়ে, মহাত্মা গান্ধী এই সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেন ১৯২৮ সালের ৭ই জুন তারিখের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে—"defiling the Ganges"!

কিন্তু, কাশীর গঙ্গার সেই অবলাঞ্ছনার কথার ও আমার নৌকাবাসের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ এখানে আর নয়। সেই বজরায় থাকাকালেই আমার হঠাৎ যে অধিকতর ও অপ্রত্যাশিত আর এক সৌভাগ্যলাভের সূচনা দেখা দেয় সেই ঘটনাই এখন বলি।

বিশ্বনাথের সঙ্গে বসে সেদিন গল্প করছি। তার সুখদুঃখের কথা শুনছি।

তার সব সময়েই হাসিভরা প্রফুল্ল বদন। দেখে মনে হয় ভাবনাহীন আনন্দময় তার সুখের জীবন। সারাদিনই দেখি কর্মব্যস্ত। নৌকায় যাত্রীদল নিয়ে যাতায়াত করছে। অপর মাঝিমাল্লাদের সঙ্গেও মধুর ব্যবহার। ঘাটের অল্পদূরে নিজের পাকা তিনতলা বাড়ি। সেদিন নিয়েও গেল আমাকে সেই বাড়ি দেখাতে। স্ত্রী রয়েছে। একটি শিশুসন্তানও হয়েছে। মা, বাবাও আছেন। এবং সেই দিনই প্রথম প্রকাশ পেল তার আপাতসুখের সংসারের একমাত্র ঘোর দুঃখের কারণ,—তার বাবা উন্মাদ! সেই বৃদ্ধকে মাঝে মাঝে দেখেছি ঘাটের ধারে বসে থাকতে,—আপন মনে সারাক্ষণ বিড়বিড় ক'রে কী যেন কথা বলতে। তিনিই যে বিশ্বনাথের বাবা তা জানতাম না।

বিশ্বনাথ মনের গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলে, ওঁকে নিয়ে মুশকিল হয় যখন সম্পূর্ণ ক্ষেপে যান—মারধোর শুরু করেন। তখন তাঁকে সামলে রাখাই মুশকিল,—আমি ছাড়া কেউ পারে না। কাজকর্ম ফেলে তখন আমাকে থাকতে হয় ওঁরই কাছে। কতোরকম চিকিৎসা করালাম, —সারল না।

খানিক চুপ করে থেকে বিশ্বনাথ বলে, অথচ বাবুজি দেখুন, ভগবানের দয়ায় আমার কোন অভাব নেই,—রোজগার করি ভালই। এই কাশীর গঙ্গায় তো বটেই, তাছাড়া মোটা রোজগার হয় আমাদের প্রয়াগের কুম্ভমেলায়।

তার জীবনের বেদনাদায়ক প্রসঙ্গটি এড়ানোর উদ্দেশ্যে কৌতূহল প্রকাশ করে বলি, প্রয়াগে কুম্ভমেলা,—আর কাশীতে তোমাদের রোজ-

গার বাড়ে। কুম্ভ-ফেরত যাত্রীর ভিড় কাশীতেও খুব হয় বুঝি?

বিশ্বনাথের মুখে আবার হাসি ফোটে, মেঘ কেটে যেন রোদ ওঠে। সে বলে, না বাবুজি, তা নয়। সেসময়ে কাশীতেও যাত্রীদল বাড়ে বটে,—সেকথা বলছি না। সে তো কাশীতেই রোজগার। কুম্ভমেলার সময় আমরা দু'চারজন এখান থেকে বজরা, নৌকা নিয়ে প্রয়াগে চলে যাই, সেখানে মেলায় এক মাস খাটাই,—রোজগারও হয় বেশ ভাল রকমই।

প্রশ্ন করি, কেন? প্রয়াগের ঘাটেও তো অনেক নৌকা থাকে দেখেছি?

সে বলে, নৌকাই দেখেছেন, কাশীর মত বজরা নেই। অথচ, কুম্ভে বজরা পেলে যাত্রীরা অনেকেই ভাড়া নিতে চান। এই তো দু বছর পরেই প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ। আমার এ-বজরা যাবে সেখানে।

শুনে মন মেতে ওঠে। প্রশ্ন করি, এখান থেকে বজরায় যাবার যাত্রী পাও?

সে বলে, এখান থেকে বজরার যাত্রী কোথায় পাব? যারা যাওয়ার সবাই ট্রেনে বা বাস্-এ যায়। বজরা সব খালি নিয়ে যেতে হয়। সেখানে পৌঁছে কুম্ভস্নানের জন্যে ভাড়া খাটানো। তারপর মাসখানেক পরে মেলা শেষ হলেই আবার এখানে ফিরে আসা।

আমার চোখে মুখে কি আমার মনের ভাব ফুটে ওঠে? না হলে বিশ্বনাথ তখনি প্রশ্ন করে কেন,—যাবেন নাকি বাবুজি? চলুন না। আপনার তো নৌকায় থাকতে ভালই লাগে দেখছি। এ তো আপনারই বজরা,—চলুন আমাদের সঙ্গে।—উৎফুল্ল মুখে আমার পানে তাকায়।

আর আমার মন তো পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বলি, ঠিক আছে। যাব, এবং ফিরবও তোমার বজরায়। কবে রওনা হবে, সময়মত আমাকে জানিও, ঠিকানা রেখে যাব। খবর পেলেই চলে আসব।

তারপর প্রশ্ন করে জানি, কাশী থেকে এলাহাবাদ নদীপথে প্রায় দেড়শ' মাইল দূর। বজরায় যেতে দিন দশেক লাগে। ফেরবার পথে

স্রোতের অনুকূলে আসা,—পাঁচ-ছয়-দিনের বেশি সময় লাগে না।

বিশ্বনাথ খুশীমনে জানায়, ঠিক রইল বাবুজি, নিশ্চয় যেন আসবেন।

আমি মনে মনে ভাবি, এ সুবর্ণ সুযোগ কি কখনও হারানো চলে!
চিরন্তন ট্রেনে নয়, মোটরে নয়,—গঙ্গাতরঙ্গে বারাণসী থেকে প্রয়াগ!
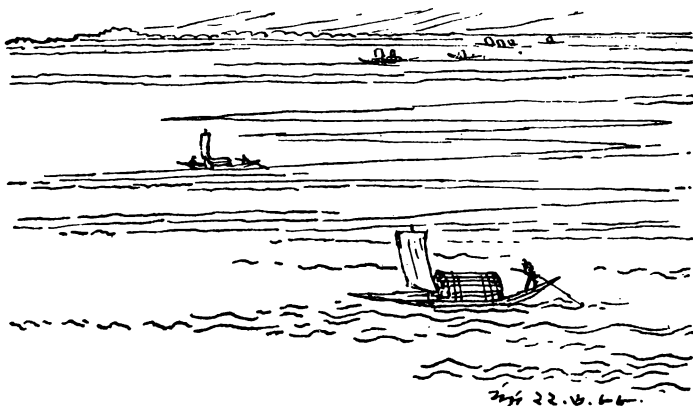
॥ দুই ॥

উনিশশো পঁয়ষট্টি সাল। ডিসেম্বর মাস।

হিমালয় পরিব্রাজন থেকে ফিরে এসে সাঁওতাল পরগণার শান্ত নিভৃতিতে বিশ্রামরত। তখনও মন জুড়ে হিমালয়ের "যত নদনদী/ঘুম পাড়াবার গান গাহে নিরবধি/ঘেরি ক্লান্তদেহখানি শতবাহুপাশে" '—হঠাৎ যেন তারই মাঝে জননী জাহ্নবীর ডাক শুনি। জেগে ওঠে মন,—ঠিকই তো! আগামী মাসেই না প্রয়াগের পূর্ণকুম্ভ! কাশী থেকে বিশ্বনাথের আহ্বান এইবার নিশ্চয় এসে যাবে!

সেই প্রতীক্ষায় দিন কাটে। নদীপথে ভ্রমণের অদম্য আগ্রহে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ভাবি, কেনই বা তার ডাকের অপেক্ষায় এখানে বসে থাকা! চলেই যাই না, এখনি কাশীতে! সেখানেই না হয় কদিন যাত্রার আগে কাটানো যাবে! সেইমত অবিলম্বে রওনাও হই।
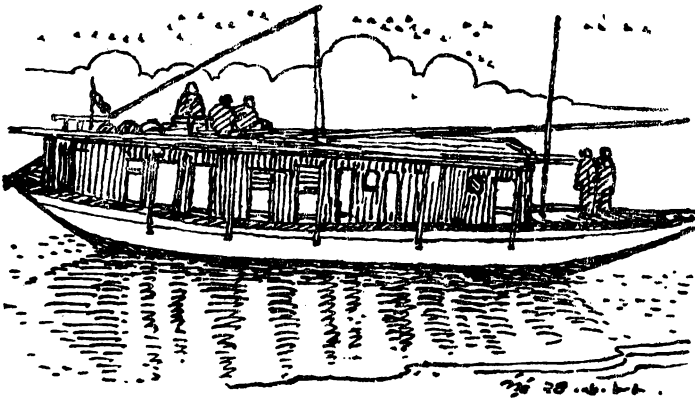
॥ তিন ॥

এবার কাশীতে গিয়ে উঠি রাণামহলে। সেখানে ওঠার একটা ইতিহাস আছে। সে-কাহিনীও বলি।

রাণামহলের এই অংশে এর আগেও একবছর কয়েকমাস কাটিয়ে গিয়েছি,—সেও মহা-আনন্দে। এখানে থাকার সেই ব্যবস্থা করে দেয় পরম স্নেহাস্পদ দেবপ্রসাদ। হিমালয় ভ্রমণ-সাহিত্যজগতে তার প্রথম অবদান,—"একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে"। তার সে-বই লেখা হওয়ার আগে হিমালয়ের পথেই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তার বই-খানিতে সে কাহিনী সে লিখেছেও। কিন্তু, যে ছোট্ট ঘটনাটি সে উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করে নি, সেইটিই হিমালয়ের পথে সেই সময়ে তার সম্পর্কে আমার চোখে লেগেছিল বিস্ময়কর ও অতি বিসদৃশ দৃশ্য।

কেদারনাথের যাত্রাপথে ত্রিযুগীনারায়ণে দেবপ্রসাদের দলের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ও পরিচয়। তারপর আবার মাঝে মাঝে পথে দেখা হয়। এর পর অন্য অঞ্চল ঘুরে ক'দিন পরে আমি তুঙ্গনাথ পৌঁছুই। দেখি, দেবপ্রসাদরাও তখন সেখানে। সে তার সঙ্গীদের নিয়ে একটা দোকানের সুমুখে বেঞ্চের ওপর, সেই প্রচণ্ড শীতের দেশে সকালের মিঠে রোদে, আরামে বসে মহানন্দে ঠোঙ্গা হাতে কী খেতে ব্যস্ত। এ-পথে এটা কিছু অভিনব দৃশ্য নয়। কিন্তু, আশ্চর্য হই দেখে, তার এক সঙ্গী তার ওপর-হাতে কি-যেন ইন্‌জেক্‌শন দিচ্ছেন!

আমাকে দেখে দেবপ্রসাদ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, বাঃ! আপনার সঙ্গে আবার দেখা! আমরা কাল এসেছি এখানে।

প্রশ্ন করি, ওটা কী হচ্ছে?

সে একগাল হেসে বলে, গরম জিলিপি ভাজা হচ্ছে, তাই খাচ্ছি। চলে আসুন, বসবেন এখানে, একেবারে গরম গরম খাবেন।

আমি বলি, জিলিপির কথা জিজ্ঞেস করছি না, ইন্‌জেক্‌শন নিচ্ছ কেন ?

সে তেমনি হাসি মুখে উত্তর দেয়, এই জিলিপি খাচ্ছি বলেই ! ইন্‌স্যুলিন নিচ্ছি। আমার যে ভীষণ ডায়াবিটিস্‌ !

তার কথা শুনে চমকে উঠি। তার সেই হাসির উচ্ছ্বাসের অন্তরালে কীসের যেন কালো ছায়া দেখি।

সেই ছায়াই কয় বছর পরে ঘনীভূত হয়ে দেখা দেয়। দেবপ্রসাদের অকালমৃত্যু হয় এই কাশীতেই ডায়াবিটিসেরই বিষময় ফলে ! একটি শক্তিমান সাহিত্যজীবনের পূর্ণরূপে ফুটে ওঠার আগেই অবসান ঘটে !

কিন্তু, তার আগে হিমালয় থেকে কলকাতায় ফিরে আসার পর আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 'একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে' সে রচনা করে, প্রকাশিতও হয়। সে তার চাকুরি ছেড়ে দিয়ে সাহিত্য-সেবার ব্রত নেয়। চলে আসে কাশীতে। সুযোগ পেলেই হিমালয়ে ঘুরতে বার হয়। ফিরে এসে সেইসব ভ্রমণ কাহিনী লেখে। এইভাবে আরও কয়েকখানি বই প্রকাশও করে। কাশীতে এসে তার বাস করার কারণ, তার মা তখন থাকতেন সেইখানে সর্বজনশ্রদ্ধেয়া অশীতিপরা তাঁর জ্যেষ্ঠাভগিনীর নিকটে, তাঁর সেবাশুশ্রূষার জন্যে।

তাঁর সেই দিদি কাশীতে 'বড়মা' নামে প্রসিদ্ধা ছিলেন। তিনি সম্পর্কে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভগিনী হোতেন। বালবিধবা। সর্বস্ব দান করে কাশীবাসিনী হন্‌ ! সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের মহিলা-বিভাগের দায়িত্বভার নিয়ে সেবাব্রতে দীর্ঘকাল কাটান। বার্ধক্য অবস্থায় দশাশ্বমেধ-ঘাটের নিকটে রাণামহলের এক অংশে তাঁর থাকবার সুব্যবস্থা মিশন থেকেই হয়।

সেই সুবিশাল রাণামহলের আর এক প্রান্তে, ক'বছর আগে, এক-

বার দেবপ্রসাদ আমারও থাকবার আয়োজন করেন। সেই সময়ে 'বড়মা'কে আমার প্রথম দেখা। তখন তাঁর নব্বুই বছরের ওপর বয়স। যেন, অস্তোন্মুখ সূর্য। দিনশেষের স্নিগ্ধ রক্তিম গরিমা। হাতে 'লয়ে স্বর্ণবারি পশ্চিম সমুদ্র হতে ভরি শান্তিবারি' শেষদিনটির প্রতীক্ষায়। দেহ অপটু। তবুও, চলে ফিরে বেড়ান। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত চোখের চাহনি। সেই বয়সেও তাঁর দৃষ্টিশক্তি যে কতো প্রখর ছিল, তার এক ঘটনা বলি।

গঙ্গার বাঁধানো ঘাট থেকে সেই রাণামহলের পাঁচ-ছয় তলা উঁচুতে বড়মার থাকবার ঘর। একদিন বিকালে ঘাটের ধারে বেড়িয়ে ওপরে তাঁর ঘরে এসেছি। আমাকে দেখেই হেসে বলেন, ঠিকই তো দেখেছি তা'হলে। এই জানলার ধারে বসে একটু আগে নিচের ঘাটে দেখলাম তুমি বেড়াচ্ছ—ঐ গেরুয়া পাঞ্জাবিটা গায়ে, একবার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা বললে,—তার পরনে ছিল একটা কালো কোট। —আমি শুনে অবাক হয়ে বলি, এই বয়সে অতোদূর নিচে দেখে চিনলেন কী করে? ঠিকই দেখেছেন, বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা,—দাঁড়িয়ে, তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা হয়েছিল বটে!

সেই বয়সে বড়মার তখনও এমনি তীক্ষ্ণ নজর।

তাঁর আন্তরিক স্নেহের কথাও বলি।

গঙ্গার উঁচু পাড়ের গায়ে রাণামহলের বিশাল অট্টালিকার বিচিত্র গঠন ও অবস্থান। অনেকটা পাহাড়ের গায়ে তৈরি ঘরবাড়ির মতন। গঙ্গার ঘাট থেকে সামনে পাঁচ-ছয় তলা উঁচু, অথচ ওপর তলায় প্রবেশ-পথ পিছন দিকে উঁচু পাড়ের মাথায় সমতল ভূমি দিয়ে, সেখানে মনে হয় পাঁচতলা যেন একতলা। তারই একপ্রান্তে আমার থাকবার ঘর। বড়মার অংশ থেকে বাইরে বার হয়ে একটা মাঠ পেরিয়ে আমার ঘরে আসতে হয়। প্রতিদিন সকালে বড়মা তাঁর ঘর থেকে মহলের বাইরে বেরিয়ে মাঠ দিয়ে আমার দরজার কাছে এসে সস্নেহে ডাকতেন, কই! উমা-

প্রসাদ! কোথায় তুমি!—আমি ত্বাড়াতাড়ি এসে দাঁড়াই। হাতে তাঁর পূজার আশীর্বাদী ফুল। নতশিরে প্রণাম করে জোড়হাতে নিই। এ-নেওয়ার যে কী মধুর আনন্দ ও তৃপ্তি ছিল, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

এই আশীর্বাদী ফুল দেওয়া তাঁর এমনি নিত্যনৈমিত্তিক কাজ হয়ে ওঠে যে আমি কাশী থেকে হরিদ্বার চলে যাওয়ার পরেরদিনও তিনি সকালে আমার ঘরের উদ্দেশে বার হন্। দেবপ্রসাদ দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করে, বড়মা, কোথায় চলেছ তুমি?

বড়মা জানান, উমাপ্রসাদকে আশীর্বাদী ফুল দিতে।

দেবপ্রসাদ হেসে বলে, সে তো গতকাল হরিদ্বার রওনা হয়েছে।

তিনি অবাক হয়ে বলেন, সে কী! সে চলে গেল, আমার সঙ্গে দেখা করে গেল না!

দেবপ্রসাদও আশ্চর্য হয়ে জানায়, কেন? কাল তো যাবার আগে কতোক্ষণ বসে তোমার সঙ্গে কথা বলে গেল, জানিয়ে গেল, হরিদ্বার যাচ্ছি, তোমাকে প্রণাম করলে, তুমি আশীর্বাদ করে ফুল দিলে,—সব ভুলে গেলে!

তিনি অতি সহজভাবে কথাগুলি শুনে বলেন, ওমা! তাই নাকি? আমার তো এসব কিচ্ছুই মনে নেই!

এই ভুলে যাওয়া,—বা মনে না রাখা,—তাঁর মানসিক এক বিচিত্র পরিণতি। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী অতি সহজেই ভুলে যান, অথচ, বহু পুরাতন সব স্মৃতি তাঁর মনের দুয়ার খুলে উজ্জ্বলবেশে দেখা দেয়। তাঁর কাছে বসে তাঁর ছেলেবেলার কতো ঘটনা মুগ্ধ হয়ে শুনি। সেকালে মেয়েদের বিবাহ হোত অতি অল্প বয়সে। সাত-আট বছর বয়সে নববধূ-বেশে শ্বশুরবাড়িতে কেমন ভাবে থাকতেন, কবে কীসব ঘটনা ঘটেছিল, —আশি বছরেরও আগে,—তার নিখুঁত বর্ণনা দিতেন, শুনতে শুনতে চোখের সামনে সে-সব ছবির মত ফুটে উঠত। অথচ, তারই মাঝে হঠাৎ হয়ত গল্প থামিয়ে দেবপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, হ্যাঁরে দেবু! আজ দুপুরে আমাকে ভাত দিয়েছিল? আমার খাওয়া হয়েছে? দেবু

হেসে বলে, সেকী! এই তো কিছুক্ষণ আগে খেলে—এইখানে বসেই! ভুলে গেলে?

শুধু আধুনিক ঘটনারই স্মৃতিভ্রংশ নয়, অপরদিকে স্নেহেরও এক বৈচিত্র্যময় বিপর্যয়! নবপরিচিত আমার প্রতি তাঁর অমন গভীর স্নেহ, অথচ, পুরানো স্নেহের পাত্রকে অদ্ভুতভাবে ভুলে যাওয়া। এ-যেন সাগর-মুখী বিশাল নদীর এক তীরে খরস্রোত, অপর পাড়ে চড়া!

তারই এক ঘটনা শুনি একদিন দেবপ্রসাদের কাছে,—কাল কী হয়েছে জানেন? আমাদের এক জামাই—বড়মার সম্পর্কে নাতজামাই—হঠাৎ মারা গেছে, শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র পেলাম। সেই নাতনীটি বড়মার অত্যন্ত আদরের পাত্রী ছিল, অল্প বয়সেই বিধবা হোল। তাই ভাবলাম, বড়মাকে আর এই দুঃসংবাদটা জানাব না। কী হবে তাঁর মনে কষ্ট দিয়ে; শুনে কান্নাকাটি করতে থাকবেন। তারপর, বেড়িয়ে ঘরে ফিরেছি, বড়মার সঙ্গে দেখা হতেই প্রশ্ন করেন, হাঁরে দেবু, কে মারা গেছে রে? তোর টেবিলে দেখলাম, কাগজপত্তর ছত্রাকার করে রাখিস্, তাই গুছিয়ে রাখতে গিয়ে নজর পড়ল, একটা শ্রাদ্ধের চিঠি,—কে মারা গেল?—আমি বলি, তুমি আবার আমার টেবিল ঘাঁটতে যাও কেন?—তারপর মৃত্যুসংবাদটা আর গোপন রাখি না, তাঁকে জানাই,—অমুক মারা গেছে।

"সে কে রে? আমাদের কেউ হয় নাকি?"

আমি অবাক হয়ে বলি, চিনতে পারলে না? তোমাদের নাতনী,—অমুকের স্বামী!—

—খবরটা শুনে বড়মার মুখে বা মনে শোকের বিন্দুমাত্র ছায়াপাতই হোল না, নির্বিকারভাবে নিরুত্তাপ কণ্ঠে শুধু মন্তব্য করলেন, ওঃ! ছোট খুকিটা বুঝি বিধবা হোল!—তারপর চলে গেলেন অন্যদিকে।—আমি অবাক!

এমনি সব স্মৃতিভরা সেই রাণামহলের আমার আগের-বার থাকার অংশে এবারও দেবপ্রসাদ আমার থাকবার আয়োজন করেন।

॥ চার ॥

রাজপুতানার রাণাদের এককালের বিশাল প্রাসাদ। দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকটেই। একেবারে গঙ্গার বাঁধানো ঘাটের উপর লালরঙের ইট পাথরে গাঁথা দুর্গের আকারে। দুর্গের মতন কয়টা গোলাকার মিনারিকাও আছে। তারই শীর্ষদেশে একটা গম্বুজের চারদিক দেওয়াল গেঁথে আট-কোণা ঘর। দরজা জানলা বসানো। গতবারের মত এবারও এই ঘরে গিয়ে উঠি। এ-যেন ঘরে থাকা নয়, গঙ্গাবক্ষেই বাস। ঘাট থেকে সোজা উঠেছে আকাশমুখী মিনার। তারই মাথায় গম্বুজ। গম্বুজঘর ঘিরে খোলা একফালি সরু বারান্দা। সারাক্ষণই গঙ্গাদর্শন। ঘরে বসে বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে হয় যেন গঙ্গার বুকে ভাসমান জাহাজের উর্ধ্বতম দেশে ক্যাপ্‌টেনের কেবিন!

এখানে অবশ্য জাহাদের দোলানি নেই। তবে, হাতখানেক মাত্র উঁচু পাথরের রেলিং-এর ধারে, হাত দেড়েক মাত্র চওড়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে বহুনীচে সেই নদীর জলস্রোতের ও ঘাটের জনপ্রবাহের দিকে তাকালে মাথা ঘোরার কথা।

এবার অবশ্য এই রাণামহলে আমার থাকা মাত্র কয়েকটা দিনের জন্যে। বিশ্বনাথের বজরার প্রয়াগ-যাত্রারাম্ভের অপেক্ষায়।

কাশীতে পৌঁছেই বিশ্বনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করি। দেখা হতেই সে উৎফুল্ল হয়ে বলে, বাবুজি, এসে গেছেন আপনি! পরশুদিনই মাখন-বাবুকে বলেছি আপনাকে চিঠি দিতে আসবার জন্যে!

আমি হেসে বলি, সত্যিই যে মনে মনে আমার আসা চেয়েছ, এই দেখ তার প্রমাণ। চিঠি না পেলেও কেমন সাড়া দিয়ে চলে এলাম!

রানাঘাট
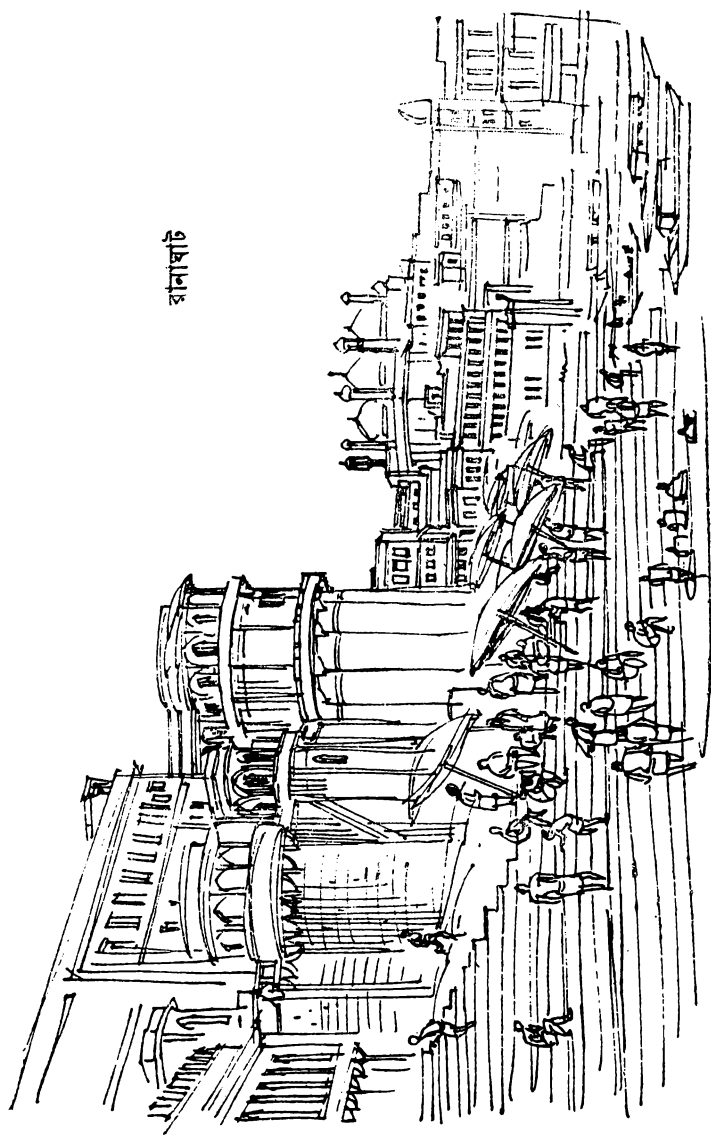
সে বলে, খুব ভাল হোল। ৩০শে ডিসেম্বর—শুভদিন, দাদাজি বলেছেন। সেদিন সন্ধ্যায় বজরা যাত্রা করবে, তবে কাশীর এপার থেকে রওনা হয়ে গঙ্গার অপরপারে গিয়ে রাত কাটানো। একা আমারটাই তো শুধু যাবে না, আরও ১৫।১৬টা নৌকা, বজরা যাবে। যে যার সুবিধা ও ইচ্ছামত রোজ চলবে, কিন্তু দু'একটা খারাপ জায়গা আছে—ডাকাতের ভয়—সেখানে দল বেঁধে রাত কাটাতে হয়,—বজরা নোঙর করে।

তারপর দুঃখপ্রকাশ করে জানায়, তার নিজের কিন্তু বজরার সঙ্গে যাওয়া সম্ভব হবে না, তার বাবার আবার রোগের বাড়াবাড়ি চলেছে, কাশীতে জরুরী অন্য কাজও রয়েছে। তবে, প্রয়াগে মেলা শেষ হওয়ার আগে সে সেখানে যাবে, তাই দেখাও হবে।

শুনে মন বিষণ্ণ হয়। বলি, তুমি সঙ্গে থাকবে না,—বিশ্বনাথ! খুবই দুঃখের কথা।

সে আশ্বাস দেয়, আমার ভগিনীপতি বদরী যাবে বজরা নিয়ে। খুব হুঁশিয়ার আদমী। সঙ্গে তার আরও ছয়জন মাঝিমাল্লা থাকবে। আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

ভাবি, এই দীর্ঘ জলযাত্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে একাকী যাওয়া-আসা! কিন্তু, উপায়ই বা কী! দেখাই যাক্, ভাগ্য-বিধাতা কপালে কী লেখেন!

গতবার নৌকাবাসের সময় বিশ্বনাথের অকুণ্ঠ সাহচর্য ও সেবাযত্ন লাভ করেছি, অনেকটা তারই ভরসায় আসা,—সে-ই এখন যেতে পারবে না শুনে যাত্রারম্ভে কেমন যেন সাথীহারা মনোভাব জাগে।

কিন্তু, বিধাতাপুরুষ অলক্ষ্যে হাসেন। জীবনের পথে কোথায়, কতো-টুকু কে কাকে সাথী পাবে, সে কী কেউ বলতে পারে!

পরদিনই হঠাৎ এসে হাজির,—শেষকিরণ সুরানা। হিমালয়ে কুয়ারি-

গিরিপথের আমার সেই তরুণ সঙ্গী। সে তখন থাকে বম্বেতে। হঠাৎ এখানে,—কাশীতে! কী ব্যাপার? তার অফিসের কাজে নাকি?

সে প্রফুল্ল মুখে জানায়, চিঠিতে আপনার প্রোগ্রাম জানতে পেরেই ছুটির দরখাস্ত করে চলে এলাম। সঙ্গে যাব আমি। আবার কী! এমন সুযোগ কী হারানো চলে? আর, আপনাকে একা যেতে ছেড়ে দেব,—তাও কী হয়! বলুন, যাত্রার দিন কবে ঠিক হোল? জিনিসপত্র সঙ্গে কি-কি নিয়ে যেতে হবে? কেনাকাটার কি আছে? লিস্ট করেছেন?

নিশ্চিন্ত মনে তার হাতে ব্যবস্থার ভার ছেড়ে দিই। সে নিখুঁত ভাবে সব করেও। এ তার স্বভাবগত চারিত্রিক গুণ। যেমন নিষ্ঠাভরে করে, তেমনি ক'রে আনন্দও পায়।

দেবপ্রসাদের সহায়তায় একটা প্রেসার কুকার সংগ্রহ করে আনে। দেখিয়ে বলে, দেখুন তো, এইটেতে বজরায় রান্না করলে কতো তাড়াতাড়ি সহজেই আমাদের রান্না হয়ে যাবে।—তারপর, মৃদু হেসে বলে, অবশ্য রান্নার ভারটা আপনার, আমি সব মাজা-ধোওয়া পরিষ্কার করব।

আমি বলি, স্টোভের ব্যবস্থা? সে দেখায়, ঐ তো কিনে এনে ওখানে রেখেছি;—'জনতা' পাওয়া গেল না। তারপর হাসিমুখে বলে, নামটা দেখবেন?—Lifetime!

আমিও হেসে বলি, কার লাইফ্? স্টোভের,—?

কিছু তাজা সব্জিও সঙ্গে নেবে জানায়। শীতকাল,—কদিন থাকবেও। তাছাড়া, গঙ্গার ধারে গ্রাম শহর তো মাঝে মাঝে পাওয়া যাবেই, তখন আবার কেনা যাবে।

দেবপ্রসাদ বলে, আমার সেই চেনা দুধের দোকানে বলে রেখেছি, খুব ভাল করে সেদিন ঘন দুধের সের খানেক দই পেতে দেবে, নিয়ে যাবেন।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করি, দু'জনের জন্যে এক সের দই!

সে জানায়, দুতিনদিন ধরে খাবেন, এই শীতে নষ্ট হবে না দেখবেন। আপনি তো দুধ-দই-এর ভক্ত। আর, দধি তো শুভকর্মের মাঙ্গলিক।

আমি মন্তব্য করি, বিশ্বনাথ যাবে না শুনে আমি তো নিঃসঙ্গ গঙ্গা-যাত্রায় চললাম ভাবছিলাম,—এখন দেখছি তোমাদের দুজনের উৎসাহে ও আয়োজনে কদিন গঙ্গাবক্ষে পিক্‌নিকেরই ব্যবস্থা হচ্ছে!

যাত্রার অধীর আগ্রহে চক্ষের নিমেষে ক'দিন কোথা দিয়ে কেটে যায়। ৩০শে ডিসেম্বর আসে।

কাশীর সেই একই গঙ্গা, পরপারে সূর্যোদয়ের সেই রক্তিম ছটা,—তবুও, আজ মনের তারে নতুন এক সুরের ঝঙ্কার তোলে!
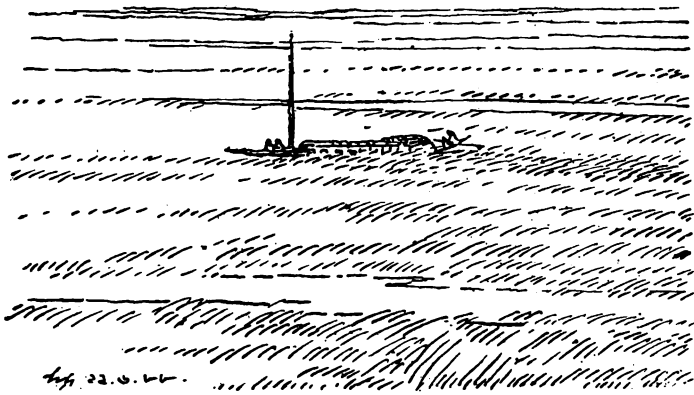
॥ পাঁচ ॥

বিশ্বনাথ জানিয়েছে, বজরা দুপুরে রাণামহলের নিচেই ঘাটে এসে থাকবে। আমরা বিকেলে জিনিসপত্র নিয়ে যেন নেমে আসি, বজারয় এসে গুছিয়ে বসি। সন্ধ্যা নামার আগে মাঝিরা বজরা নিয়ে যাত্রা শুরু করবে। আজ কেবল গঙ্গার অপর পারে গিয়ে থাকা।

সেইমত মালপত্র নিয়ে বিকেলে বজরায় ওঠা হয়। কী-ই বা আর মালপত্র! বজরায় শতরঞ্চি বিছানো আছে, তার ওপর চাদর বিছালেই শয্যা পাতা হোল। মাথায় দেওয়ার থাকবে হাওয়া-বালিশ। গায়ে স্লিপিং ব্যাগ। কিন্তু, দেবপ্রসাদ শোনে না। খানকয়েক কম্বল নিয়ে আসে। বলে, এ তো আর হিমালয় পথে যাত্রা নয়, মাল বইতে পোর্টার লাগবে না, শেষকিরণের পিঠেও রুক্‌স্যাকের ভার বাড়ানো হবে না। বজরায় সব যাবে, বজরায় থাকবে, বজরাতেই ফিরে আসবে। গরম জামাকাপড়ও সঙ্গে যা কিছু রয়েছে, নিয়ে যান্। পৌষ মাস, গঙ্গার কোলে বাস। তার ওপর, সুমুখেই যাকে বলে—মাঘের শীত! তা ছাড়া, প্রয়াগে পৌঁছেও সেই গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে চড়ার ওপর তাঁবুতেও তো কুম্ভমেলার ক'দিন কাটাবেন,—প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পাবেন।

বলি, জানি, প্রয়াগে সেই চড়ায় কী দুর্দান্ত শীত! একবার এই সময়েই তো সেখানে মা'র সঙ্গে এক মাস কল্পবাস করেছিলাম—হোগলা ছাওয়া, খড় বিছানো চালা ঘরে! নদীর বালির চড়ার ওপর কী ভীষণ স্যাঁতস্যাঁতে কন্‌কনে ঠাণ্ডা! এখনও ভাবলে গা শিউরে ওঠে। সঙ্গমের ওপর কল্প-বাসীদের চালাঘর, সরকারী অফিসারদের তাঁবু, সাধু-সন্ন্যাসীর আখড়া,—সে যেন গড়ে ওঠা বিরাট কলোনী! শীতের কষ্ট ছিল ঠিকই,—কিন্তু

যে অভিনব অভিজ্ঞতা ও অপূর্ব আনন্দ লাভ হয়েছিল তা এখনও ভাবলে আবার যেতে ইচ্ছা করে !

অতএব, দেবপ্রসাদের ইচ্ছামতই ব্যবস্থাও হয়।

জিনিসপত্র বজরায় গুছিয়ে রেখে শেষকিরণ দেবপ্রসাদের সঙ্গে নেমে যায়,— সেই দোকান থেকে অর্ডার-দেওয়া দই আনতে। আমি বজরায় তাদের অপেক্ষায় থাকি।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাদের ফেরবার কথা,—ঐ তো ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গলির মধ্যে অল্প এগুলেই সেই দুধ-দই-এর দোকান। যাবে আর আসবে। কিন্তু, আধ ঘণ্টার জায়গায় প্রায় দু ঘণ্টা কাটে, তবুও তাদের দেখা নেই। এদিকে সন্ধ্যা নামে। বিশ্বনাথ অপেক্ষা করে বিদায় নিয়ে তার নিজের কাজে চলে যায়। মাঝিরাও তাগাদা দেয়। আমারও অস্বস্তি বোধ হয়। ভেবেই পাই না, তাদের এতো বিলম্বের কারণ কী হতে পারে ?

অবশেষে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ করে তারা ফেরে। শেষকিরণের উত্তেজিত হাবভাব। শুধু বলে, দেরী হয়ে গেল !

দেবপ্রসাদের কাছে এই বিলম্বের কারণ শুনি, সেই দোকানে আমরা যখন দই নেওয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে, এমন সময় পাশের অপর এক দোকানে কী নিয়ে এক হাঙ্গামা বাঁধে। দেখতে দেখতে পুলিসও এসে যায়। আমাদের দই-এর দোকানের ছেলেটিকেও পুলিস অকারণ ও অন্যায়ভাবে ঐ হাঙ্গামায় জড়িত বলে থানায় জোর করে নিয়ে যেতে চায়। শেষকিরণ প্রতিবাদ করে। তার পক্ষ নিয়ে পুলিসের সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে থাকে। পরিশেষে পরিস্থিতি এমনি দাঁড়ায় যে শেষকিরণকেও থানায় নিয়ে যাবার উপক্রম হয়। শেষকিরণকে যতো বলি, নৌকায় তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, —চল, তুমি নিজে আর এর মধ্যে জড়িও না,—সে কোনোমতেই শুনবে না, বলে, একটা সম্পূর্ণ নির্দোষ ছেলেকে পুলিস অযথা এভাবে ধরে নিয়ে যাবে, হয়রান করবে,—আর আমরাই ত' এর সাক্ষী, একে বিপদে ফেলে

রেখে চলে যাব? কখনওই হতে পারে না।

শেষকিরণ নৌকায় এসে এতোক্ষণ চুপ করে দেবপ্রসাদের বিবরণ শুনছিল। এখন হেসে বলে, যাই হোক্,—ছেলেটাকে পুলিস শেষ পর্যন্ত ছেড়ে তো দিল—আমারই অমন জোর আপত্তিতে! আমি বলি, যাক্, একটা মহৎ পরোপকার করে যাত্রা শুরু করছ,—শুভযাত্রাই হচ্ছে,— এইবার মাঝিরা নৌকা ছাড়ুক।

দেবপ্রসাদ ম্লানমুখে বিদায় নেয়। আমাদের সঙ্গে যাওয়ার তারও প্রবল বাসনা ছিল, কিন্তু কাশী ছেড়ে যাওয়া তার সম্ভব হোল না। বজরা থেকে নেমে ঘাটে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে থাকে।

লগি ঠেলে মাঝিরা নৌকা গঙ্গার স্রোতে ভাসায়, তারপর দাঁড় টেনে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলে তীর ছেড়ে নদীর বুকে এগিয়ে চলে। ঘাটের ও তীরবর্তী বাড়িগুলোর আলো গঙ্গার জলে প্রতিবিম্ব ফেলে ঝিকমিক করে, বারাণসী যেন সজল চোখে বিদায় জানায়।

অল্পক্ষণের মধ্যে গঙ্গার অপরপারে নদীর দক্ষিণ তীরের কাছাকাছি পৌঁছে বজরা নোঙর করে। অদূরে রামনগরে কাশীনরেশের রাজপ্রাসাদ। কনকনে শীত। রাত্রিও হয়েছে। বজরার কামরার দরজা জানলা বন্ধ করে পাটাতনের ওপর স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে আমরাও শয্যাগ্রহণ করি।

বালিশে মাথা রাখতেই কানে নদীর জলের কলকল মৃদুধ্বনি শুনতে পাই, গঙ্গাপ্রবাহের তরঙ্গহিল্লোল শায়িত দেহ ধীরে ধীরে দোলা দিতে থাকে।

শেষকিরণ উল্লসিত হয়ে মন্তব্য করে, এ যে মায়ের কোলে শুয়ে দোল খাওয়া,—মৃদুমন্দ কণ্ঠে ঘুমপাড়ানি গান শোনা!
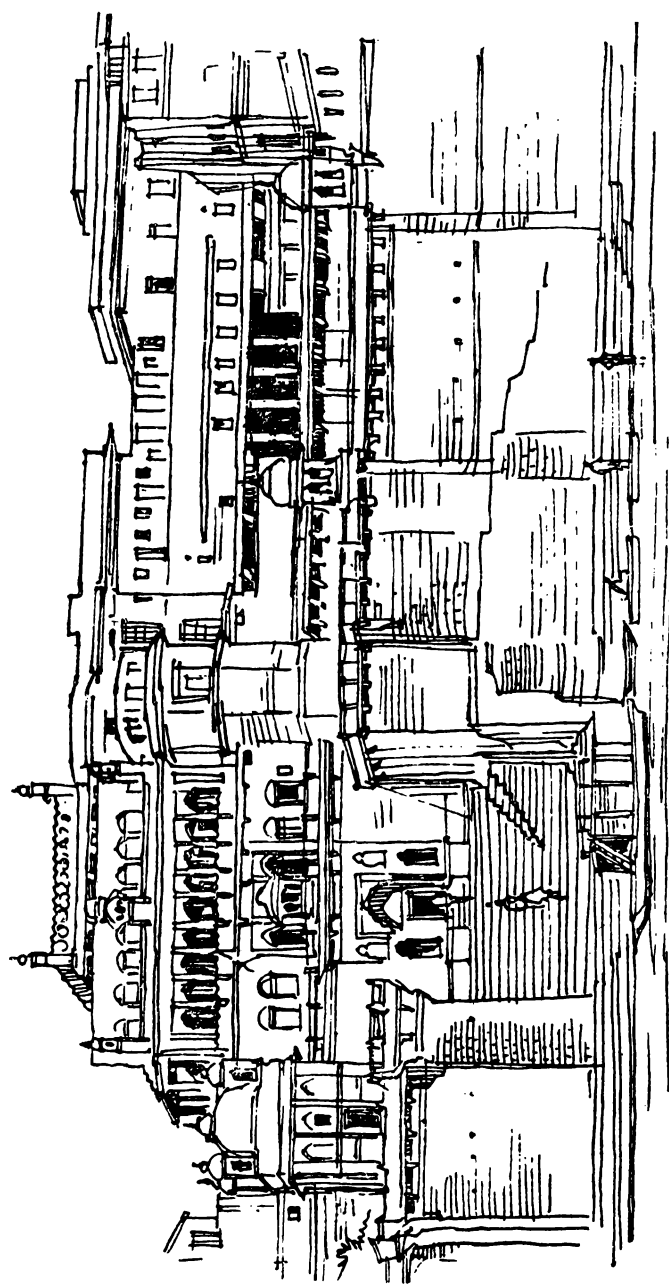
রামনগরের রাজপ্রাসাদ

এইভাবে শৈশবের স্মৃতির দোলায় দোল খেতে খেতে দুজনে কখন ঘুমিয়ে পড়ি। সে-ঘুম ভেঙে যায় গভীর রাতে, বজরার হঠাৎ সজোর দোলানিতে। কে যেন ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তোলে। চমকে উঠি। বোঝবার চেষ্টা করি। নিকটে লোকজনের চাপা গলা শুনি। ব্যাপার কী!

শেষকিরণও জেগে তাকায়। তখনি তড়াক্ করে উঠে দাঁড়ায়,—টর্চ হাতে। বজরার জানলা ফাঁক করে দেখে। কাশীর গঙ্গার এই অপরপারে চোর-ডাকাতের কুখ্যাতির প্রচার আছে।

শেষকিরণ ফিরে আসে। নিশ্চিন্ত মনে আবার শুয়ে পড়ে। বলে, অমন গাঢ় ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে! আমি ভাবলাম কী-না-কী ব্যাপার যাত্রার প্রথম রাতেই! কিছুই নয়,—পাশেই কাঠ বোঝাই দুটো ঢাউস নৌকা এসে দাঁড়াল,—তাইতেই ঢেউ বেড়ে বজরা অমন দুলিয়েছিল। অপর সেই নৌকার মাঝিদেরই কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে!

আমি বলি, যাক্, শুধু ঢেউ-এরই দোলানি! তোমার অ্যাড্‌ভেঞ্চা-রের কোন খোরাক মিলল না! আবার তবে চোখ বোজা যাক্।
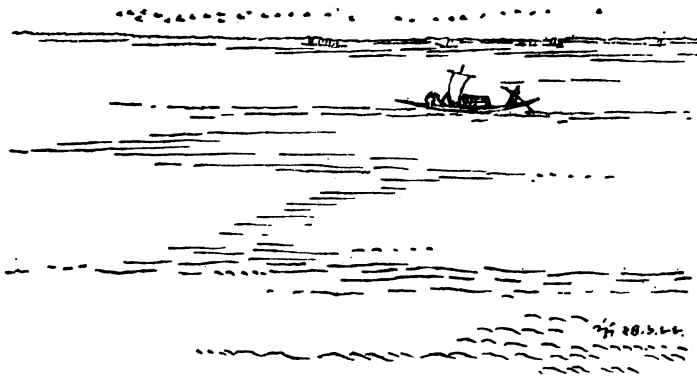
॥ ছয় ॥

আবার যখন ঘুম ভাঙে, শুয়ে শুয়েই বুঝতে পারি, বজরা দাঁড়িয়ে নেই। মাঝিরা দাঁড় টানছে। জলের ওপর দাঁড়ের শব্দ,—ছলাৎ ছলাৎ। দাঁড়ের সেই টানের তালে তালে নৌকার হেলে-দুলে, থেকে-থেকে—এগিয়ে যাওয়া। প্রতিকূল স্রোতে নৌকার এই মন্থর গতি সারাদেহে চোখ বুজে অনুভব করি। নৌকার দোলন ও জলের ধ্বনি মনে চলার ছন্দ জাগায়। ভাবি, আরামে নিশ্চল হয়ে শুয়ে,—তবুও, কেমন এগিয়ে চলি! মনে পড়ে, ট্রেনের মধ্যে শুয়ে রেলপথে চলা! ট্রেনের সেই দুরন্ত গতি! ঘড়্ ঘড়্ ঝন্‌ঝন্ কর্কশ শব্দ। সারা শরীরে সজোর ঝাঁকুনি! সে-চলার মধ্যে কেমন-যেন রূঢ়, পৌরুষ ভাব। আর আজ? জলপথে ভেসে চলা,—নৌকার মধ্যে শুয়ে থাকা;—প্রকৃতই এ-যেন মায়ের নরম কোলে মাথা পেতে শুয়ে দোল খাওয়া। এ-চলার আনন্দ-স্বাদই অপরূপ। আর, গঙ্গাবক্ষে ভেসে চলা,—ভাবতেই মন পুলকিত হয়!

শেষকিরণ উঠে কামরার বাইরে যায়। অল্প পরে ফিরে আসে। শীত-কুণ্ঠিত কণ্ঠে জানায়, চারদিক ঘন কুয়াশায় ছেয়ে রয়েছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঢাকাঢুকি দিয়ে মুখ ধুতে বার হবেন,—বাইরে কনকনে শীত।

বালতি, মগ বাইরে নিয়ে যায়। আমিও উঠে সেখানে গিয়ে দাঁড়াই। চারদিক ঝাপ্‌সা। নিস্তব্ধ জলের ওপর পাতলা কুয়াশার আচ্ছাদন। ভোরের আলো কুয়াশার সেই আবরণ ছিন্ন করে ফুটে ওঠার চেষ্টা করে। দূরে কোথাও কিছু দেখা যায় না। নদীর জলের উপর দিকে-দিকে ধোঁয়ার মত কুজ্‌ঝটিকা বাষ্পকণার কুণ্ডলির আকারে পাক খেয়ে খানিক

ওপরে উঠে হাওয়ায় মিলায়। শেষকিরণ বলে, জলের তলায় পাতাল-পুরীতে যেন শীতে ধুনি জ্বালিয়ে কারা আগুন পোহাচ্ছে!—ভেতরে চলুন,—এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ঠাণ্ডা লাগবে। একটু বেলা হলে ছাদে ওঠা যাবে।

দুজনে নেমে ঘরে ঢুকি। স্টোভ জ্বালিয়ে চা তৈরী হয়।

ক্রমশ বাইরের আঁধার পাণ্ডুবর্ণ হয়ে আসে। দিনের আলো ফোটে। বেরিয়ে এসে ধাপ বেয়ে উঠে বজরার ঘরের ছাদে দাঁড়াই। সামনের দিকে বসে চারজন মাঝি জোরে দাঁড় টেনে চলেছে। কাশী থেকে প্রয়াগ যাওয়া—সারা নদীপথে উজান বেয়ে চলা। মাঝিরা এক সঙ্গে দাঁড়গুলি জলের ওপর ফেলে, দেহ চিতিয়ে একসঙ্গে টান দেয়, নৌকাও জল কেটে অমনি এগিয়ে চলে। দেখে মনে হয়, কেমন সাবলীল অনায়াসে দাঁড় টানা। দাঁড় যেন দেহেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। আমাদের দেখে তারা উৎসাহিত হয়। সমবেত কণ্ঠে গান ধরে, 'নদীয়াঁ দী সর্‌দার! গঙ্গারাণী! /তুষার ছীটে জল দে দেন বহার, গঙ্গারাণী!'···দাঁড় বইবার তালে তালে গাইতে থাকে।

আমাদের বজরার একপাশে বাঁধা ছই-দেওয়া একটা ডিঙি নৌকা। মাঝিদের তাইতে রান্নাবান্নার পাট। রাত্রে শোয়া আমাদের বজরাতে,—পাশে ছোট একটা কামরায়।

মাঝি সর্দার বদ্‌রী ডিঙির ওপর দাঁড়িয়ে,—হুঁকা হাতে, তামাক খাচ্ছে। আমাদের দেখে বলে, নমস্তে বাবুজি!

কাশীতে গঙ্গা উত্তরবাহিনী। আমরা কখন দক্ষিণ দিক ছেড়ে এখন চলেছি পশ্চিম মুখে,—নদীর বাঁক ঘুরে। পিছন দিকে সূর্য উঠছে। পূর্ব

দিগন্তে দূরে তীরের তরুশ্রেণীর পশ্চাতে আকাশে স্বর্ণছটা ফুটে ওঠে। ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলে নৌকা চলে। বাঁ দিকে নদীর পাড়। অল্প দূরে। সামনে হঠাৎ নদীর বুকে প্রকাণ্ড চড়া। ঘস্ শব্দ তুলে বজরা তাতে আটকে যায়। মাঝিরা দাঁড় টানা বন্ধ করে বলে ওঠে, নইয়া টিক্ গেইল্!

বদরী হুঁকা রেখে বজরায় ওঠে। লম্বা একটা লগি নেয়। জোরে ঠেলা দেয়। বজরা মুক্ত হয়। নদীর এ-তীর ছেড়ে বজরা অপর পাড়ে পাড়ি দেয়।

ক্রমশঃ সকালের স্নিগ্ধ রোদ ফুটে ওঠে। দিগ্বধূর মুখের ঘোমটা খুলে যেন হাসি ফোটে। নদীর জল ঝিক্‌মিক্ করে। শেষকিরণ নেমে গিয়ে মাদুর আনে। ছাদে বিছায়। বলে, এবার আরাম করে বসে রোদ পোহানো যাক্।

গঙ্গার বাম তটে সবুজ খেত ভরা সর্ষে ফুল। যেন, দিগন্তবিসারিত হলুদবরণ গালিচা পাতা। তীরের নিকটে পৌঁছুলে দেখি, এধারে নদীর পাড় খাড়া উঁচু। যেন, বালি ও মাটির বাঁধ। মাঝে মাঝে নদীর বুকে ধসে পড়া। নদীর জলও গভীর। খরস্রোতের আঘাতে পড়ে ভাঙছে। ঝুর্‌ঝুর্ করে পাড়ের বালি, মাটি ঝরে পড়ছে। গঙ্গার এ-পারে ভাঙন, ওপারে চড়া।

মাঝিরা দাঁড় রেখে গুণ টানতে তৈরি হয়। নৌকা ছেড়ে তীরে নামে। পাঁচজনে তিনটে গুণ টানে। বদরী এসে হাল ধরে।

শেষকিরণ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, বলুন ত' এরা হালকে কি বলে?

আমি বলতে পারি না। সে বলে, হিন্দীটা শেখেন না কেন? হালকে এরা বলে পত্‌ওয়াড়।

উঁচু নিচু ভাঙা পাড়। মাঝিরা নদীর সেই তীর ধরে কখনো উঁচুতে ওঠে, কখনো জলের ধারে নামে,—এইভাবে ওঠা-নামা করে গুণ টেনে চলতে থাকে। কোমর থেকে ঝুঁকে পড়া দেহ। দেখে বোঝা যায়,

অপরিসীম পরিশ্রম করে টেনে নিয়ে চলে। সেই টানে বজরা যেন শাণিত অস্ত্রের মত নিঃশব্দে জল কেটে এগিয়ে যায় ধীর মন্থর সহজ গতিতে,—তর্‌তর্‌ করে। হঠাৎ মনে পড়ে, ম্যাক্‌সিম গোর্কির আত্ম-জীবনীর Childhood খণ্ডে বর্ণিত এক করুণ চিত্র :

বালক Alyosha-কে (গোর্কির ডাক নাম) তার বদরাগী ঠাকুরদা কি এক সামান্য দোষের জন্য নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করেছেন। প্রহৃত অ্যালিওশা শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছে। অনুতপ্ত-হৃদয় পিতামহ ফিরে এসে তার কাছে বসেন। তার জন্যে লজেন্স, ফল ইত্যাদি এনেছেন। সস্নেহে মুখচুম্বন করে বালকের কপালে হাত বুলাতে বুলাতে স্বীকার করেন, তোর দোষের তুলনায় বড্ড বেশি এবার তোকে মেরেছি রে,—আমার মাথার ঠিক ছিল না। ছেলে বয়সে আমিও কি কম মার খেয়েছি! কতো কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে।—তারপর নিজের জীবনের গল্প শোনান,—তুই তো এখানে আমার কাছে এলি তোর ঠাকুমা ও মার সঙ্গে ভল্‌গা নদীর ওপর স্টীমারে চড়ে। আর জানিস্‌? ঐ ভল্‌গা নদীর তীর ধরে কতোবার আমাকে আসতে হয়েছে—স্টীমারে নয়, নৌকায় নয়,—পায়ে হেঁটে,—ব্যাপারীদের ঢাউস বজরার গুণ টেনে,—খালি পায়ে,—ছুঁচালো পাথরের উপর দিয়ে! রোদে মাথার ভেতর যেন আগুন জ্বলছে। তবুও, শরীর বেঁকিয়ে,—কোমর ভেঙে—গুণ টেনে চলেছি—মাথার চুলের কাঁটার মতন দেহের আকার! দেহের ভেতর হাড়গুলো মড়্‌মড়্‌ করছে,—তবুও চলেছি—তো চলেছি-ই! কোন দিকে আর জ্ঞান নেই,—শুধু নদীর পাড় ধরে চলা। মাথা থেকে কপাল বেয়ে ঘাম ঝরে চোখে ঢুকছে,—বুকের ভেতর কে যেন হামানদিস্তে দিয়ে পিষছে,—মুখ হাঁ করে হাঁফাচ্ছি—তবুও চলেছি, চলেছি,—সেই গুণ টেনে চলেছি,—সে কী কষ্ট রে! তোর এ-ব্যথা তার কাছে আর কী!—কিন্তু, এইভাবেই জীবন শুরু করে এখন দেখ্‌ছিস্‌—আমার এই সচ্ছল অবস্থা, এখন কারখানার মালিক,—অন্য লোকজনকে খাটিয়ে সেই আমিই কাজ করাচ্ছি!

জীবন্ত ভাষায় বর্ণিত সেই ছবি যেন চোখের সামনে দেখি। মন ভারী হয়ে ওঠে।

শেষকিরণ নিচে নেমে যায়। বলে, 'আমাদের প্রাতরাশ ওপরে বসেই সারা যাবে, নিয়ে আসি।' কাশী থেকে আনা মিষ্টি, নিম্‌কি। কিছু দুধও ছিল, স্টোভে গরম করে,—সব গুছিয়ে নিয়ে আসে। শীতের সকালে রোদ পোহাতে পোহাতে খাওয়া হয়। বজরাও তর্‌তর্‌ করে এগিয়ে চলে। নদীর বালি মাটির উঁচু পাড়ে ফাটল ঝুপ্‌ঝাপ্‌ শব্দ তুলে মাঝে মাঝে ভেঙে পড়ে। শেষকিরণ একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখে। মুখে তার মৃদু হাসি ফোটে। বলে, কী মনে পড়ছে জানেন? হিমালয়ে তুষারশৃঙ্গ থেকে নেমে আসা অ্যাভালান্‌স্‌! এ যেন তারই খেলাঘরের নমুনা।

পাড়ের ওপর হলুদ-বরণ বিস্তীর্ণ সর্ষে খেতের পিছনে অদূরে বড় বড় গাছের জটলা। তারই মধ্যে গ্রাম দেখা যায়। একটা সরু পায়ে হাঁটা পথ পাড় থেকে নেমে আসে জলের ধারে। সেখানে গ্রামের কয়েকটি মেয়ে। কারও মাথায় জলভরা পিতলের কলসী,—সোনার মত ঝক্‌মক্‌ করে। নদীর কূল ছেড়ে পথে উঠতে গিয়ে কোমর বেঁকিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বজরার পানে তাকায়। দুজন বালির ওপর উবু হয়ে বসে বাসন মাজে। জন তিন চার মেয়ে স্নান করতে জলে নেমেছে।

শেষকিরণ অবাক হয়ে বলে, দেখছেন ঐধারে ও-মেয়েটি মাথায় গঙ্গার মাটি মেখে চুল পরিষ্কার করছে! আমি বলি, ঐ ওদের শাম্পু,—মাথা ঘষছে। মেয়েদের দিকে তাকায় না,—ওধারে বাঁদিকে দেখ,—গঙ্গার বুকে সুমুখে কত বড় চড়া!

গুণ টানা মাঝিরা পাড় ছেড়ে জলে নামে। সেই চড়ার দিকে বজরা নিয়ে চলে।

শেষকিরণ বলে, লোকগুলো জলের মধ্যে দিয়ে এভাবে গুণ কাঁধে এগিয়ে চলল, ওদের হাঁটু ছাড়িয়ে জল বেড়ে চলেছে,—করে কী!

আমরা তাকিয়ে থাকি। জল তাদের প্রায় কোমর পর্যন্ত ওঠে। তার-

পর আবার কমতে থাকে। চরে পৌঁছে যায়। এবার তারই ওপর দিয়ে সোজা গুণ টেনে চলে।

মাঝি সর্দার বদ্‌রী লোকটি বেশ হাসিখুশি। গোপ্পেও। এতক্ষণ হাল ধরে ছিল। শেষকিরণ তাকে জিজ্ঞাসা করে, এপাড় ছেড়ে চরে এলে? আবার অপর পাড়ে পাড়ি দেবে নাকি? আজ দুপুরে নৌকো বাঁধবে কোথায়?

বদ্‌রী বলে, নদীর স্রোত দেখে, হাওয়া বুঝে নৌকা চালাতে হয়,—এখন চলব এই চড়া ধরে, এরই ঐদিকের সীমানায় দুপুরে থামব। বালির চড়ায় নেমে গঙ্গায় ভাল করে চান করে নেবেন,—কেমন পরিষ্কার জল দেখছেন এদিকে!

শেষকিরণ বলে, তাই তো দেখছি,—আরামে চান করা যাবে।—তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে, আমি এখনি চড়ায় নামছি,—ওদের সঙ্গে একটু গুণ টানি,—স্নানের আগে শরীর বেশ গরমও হবে।

শেষকিরণের লম্বা গড়ন। দোহারা চেহারা। শ্যামবর্ণ। স্পোর্টস্‌-ম্যান। খালি গা। পরনে হাফ্‌প্যাণ্ট। বজরা থেকে সে জলে ঝাঁপ দিয়ে নামে। এখানে অল্প জল। জল ভেঙে চড়ায় ওঠে। মাঝিদের একজনের কাছ থেকে গুণ নিয়ে টানতে থাকে। মাঝিরা হাসে। উৎসাহিতও হয়। শেষকিরণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জোরে টেনে চলে। নৌকার গতিবেগও বাড়ে।

আমিও এই অবসরে নিচের কামরায় ঢুকি। আমাদের রান্নার ব্যবস্থা করি। প্রেসার কুকার রয়েছে। সহজেই অল্প সময়ে হয়ে যাবে। ভাত, আলু, কপি ভাতে,—ভালো ঘি আছে। ডাল ও একটা ঝোল। চমৎকার সেই দইও রয়েছে। আবার কী চাই!

বালুচর থেকে অল্প দূরে বজরা দুপুরে দাঁড়ায়। বদ্‌রী বজরা থেকে

জলের মধ্যে একটা লম্বা তক্তা পেতে দেয়। আমি নামি তারই উপর দিয়ে। যেন স্বর্ণকণা দিয়ে গড়া বালুচর। রোদে ঝিক্‌মিক্‌ করে। গঙ্গায় অবগাহন স্নানে মনে পরম তৃপ্তি পাই।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে ঘরের মধ্যে অলসশয়নে বই পড়া। জানলার ধারে বেঞ্চে বসে শেষকিরণ। হাতে রবীন্দ্র-রচনাবলী। ওদিকে বজরাও কখন আবার চলতে শুরু করে। নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে। শেষকিরণও মৃদু কণ্ঠে আবৃত্তি করে, "ওরে তোরা কি জানিস কেউ/জলে কেন ওঠে এত ঢেউ/ওরা দিবস রজনী নাচে/তাহা শিখেছে কাহার কাছে/···"

চোখ বুজে শুনতে থাকি।

বিকালে চা খেয়ে আবার ছাতে উঠে আসা।

সেদিন আর বেশিদূর যাওয়া হয় না। শীতকালের গঙ্গা। নদীবক্ষের বিশাল বিস্তৃতি হলেও দিকে দিকে বালুময় চর, তারই মাঝে মাঝে জল-ধারা,—যেন সোনালি পটে নীল আলপনা আঁকা। এরই মধ্যে মূলধারার প্রবাহ,—তারই প্রতিকূলে বজরা এগিয়ে চলে।

সন্ধ্যার আগে নদীর বামতটের অদূরে এক চড়ার নিকটে রাত্রের জন্য নোঙর ফেলা হয়,—নদীর স্রোত ঝঙ্কার তোলে।

আমরা দুজনে ছাতে বসে। শেষকিরণ বলে, আপনি এখানে ঢাকা-ঢুকি দিয়ে বসুন। অন্ধকার হবার আগে আমি গিয়ে রুটি ক'টা সেঁকে আসি।

চুপচাপ বসে থাকি। স্বল্পপরিসর সীমিত আয়তন বজরা। কিন্তু বাইরের জগৎ কী বিশাল! চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। প্রাণীশূন্য বালুচর ধুধু করে। মাথার উপর প্রকাণ্ড আকাশ—দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত স্তব্ধ।

পশ্চিম আকাশে মেঘের অন্তরালে কখন সূর্যাস্ত হয়েছে। এখন সন্ধ্যারাগে দীপ্যমান পশ্চিম দিগন্ত। অদূরে নদীতীরের তরুরাজির ঘনমসীলেখা। যেন সন্ধ্যাবধূর রাঙাশাড়ির অঞ্চলে কালোপাড়ের রেখা। এদিকে নদীর বুকে সোনালী সবুজ নিস্তরঙ্গ জল। কলকল স্বরে বহে চলে।

প্রকৃতির এই অপরিস্ফুট বিপুলতা ও অপরিচিত দৃশ্যের অপূর্বতার মাঝে আমার মন হারায়।

হঠাৎ কীসের শব্দ শুনে চমকে উঠি। মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখি উড়ে চলে। হয়ত, বুনো হাঁসের দল। সারাদিন গঙ্গাতীরের কোন বিলে চরে এখন চলেছে নিশ্চিন্তে রাত কাটাতে—নদীর বুকে তৃণশূন্য বালুচরের নিভৃত কোন জলাশয়ে।

ক্রমে অন্ধকার নেমে আসে। আকাশের আঁধার অঙ্গনে একে একে তারাগুলির দীপ জ্বলে ওঠে। দূরে নদীতীরের অন্ধকারাচ্ছন্ন গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে গ্রামের দু'একটা আলো জোনাকীর মত জ্বলতে থাকে।

শেষকিরণ এসে ডাক দেয়, চলুন, আর এই ঠাণ্ডায় বসে থাকবেন না,—রাত্রের 'ডিনার' রেডি!
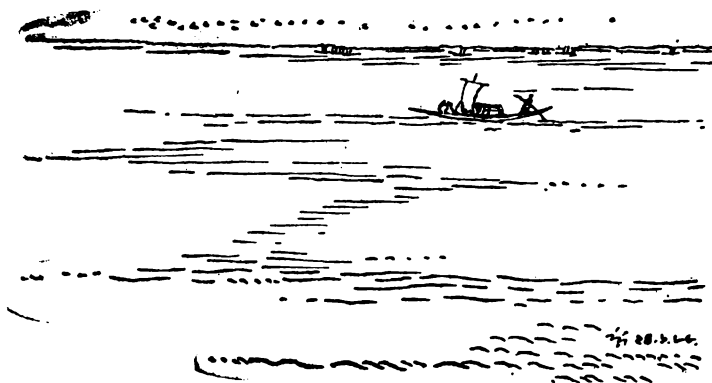
॥ সাত ॥

পরদিন। সকালে আবার যাত্রা। নদীর দক্ষিণ কূল ধরে এগিয়ে যাওয়া। কুয়াশা কেটে রোদ উঠলে ছাদে উঠে দুজনে বসি। আজও এখন মাঝিরা গুণ টেনে চলে। শান্ত তীরভূমি,—যেন শীতের সকালে রোদের কাঁথা মুড়ি দিয়ে উদাসনয়নে নদীতটে বসে। জল কেটে তর্‌তর্‌ করে বজরা এগিয়ে চলে। দেখতে থাকি, শান্তিময় রৌদ্রদীপ্ত তীরভূমির বৈচিত্র্যও ক্রমে ক্রমে কেমন পরিবর্তিত হয়। যেন, ছায়াছবি,—চলৎ-চিত্র। কোথাও গ্রামের ঘরবাড়ি, মন্দির, নদীর বালুময় তীর—গ্রামের ছেলেমেয়ে। আবার সেসব ছাড়িয়ে এসে বিস্তীর্ণ ক্ষেতভূমি। সেখানেও শস্যক্ষেত্র বিদীর্ণ করে সংকীর্ণ পথ,—দূরে কোথায়ও অদৃশ্য হয়।

এ দিনেও দুপুরে একটা চরে নোঙর করে স্নান-আহার। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার চলতে থাকা।

বিকালে ছাদে উঠি। দেখি, নদীর দক্ষিণ কূল,—অর্থাৎ আমাদের গতিপথের বাঁ দিকের তীরভূমি, লক্ষ্য করে বজরা এগিয়ে চলে। সেদিকে গঙ্গার উঁচু পাড়। গাছপালা। অদূরে এক পাহাড়। অনেকটা যেন মানুষের পায়ের চেটোর মতন আকার। প্রায় শ'চারেক ফুট মাত্র উঁচু। আধ মাইল টাক লম্বা। যেন পা বাড়িয়ে নদীর ধার পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। পাহাড়ের মাথায় দুর্গ। তাই দেখে চিনতে পারি। উৎসাহিত হই। বলি, ঐ তো চুনারের দুর্গ। ১৯৪১ সালে পূজার ছুটিতে বাড়ির সবাই এসে চুনারে ছিলাম। তখন ঐ পাহাড়ে উঠে দুর্গের ভেতর ঘুরে ঘুরে দেখেছি। পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে গঙ্গার বিশাল বিস্তৃতির অপূর্ব শোভা দেখে মোহিত হয়েছি। আর আজ গঙ্গার কোলে বসে সেই

পাহাড়কে নিচে থেকে এখন দেখা!

বজরা এগিয়ে চলে নদীতটের দিকে। পাহাড়ও যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে কাছে। পঁচিশ বছর আগেকার কতো ঘটনার স্মৃতি মনে ভেসে ওঠে!

আর, সেই একই দৃশ্য শেষকিরণের মনকে টেনে নিয়ে যায় আরও সুদূর অতীতে!

সেও উৎসাহিত হয়। বলে, ঐটা সেই চুনারের ঐতিহাসিক দুর্গ! ঐ দুর্গই তো আফগান শের খাঁ সুর মোঘল সম্রাটদের স্থানীয় শাসনকর্তার মেয়েকে বিয়ে করে কবলিত করেন। পরে হুমায়ুন আবার তার কাছ থেকে দখল করে নেন্। কিন্তু, কিছুকাল পরে শের খাঁ সুর আবার নিজের আধিপত্যে নিয়ে আসেন। পরে আবার সম্রাট আকবর পুনর্দখল করে নিলেন। ঐ দুর্গ নিয়ে এইভাবে এখানে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হয়ে গেছে। পরে আউধ্-এর নবাবের হাতে আসে। কিন্তু কয়েকবছর যেতে-না-যেতেই ইংরেজদের এখানে আক্রমণ পৌছুল। বাক্সারের যুদ্ধের কিছু পরে ১৭৭২ সালে এ দুর্গ তাদেরই করায়ত্ত হয়ে যায়।

আমি বলি, আর তার কয়েক বছর পরের ঘটনাও মনে আছে? ওয়ারেন হেস্টিংস কাশী থেকে চৈৎসিং-এর ভয়ে পালিয়ে এসে এই দুর্গেই আশ্রয় নেন্।—এর পর আর এই দুর্গ নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ হয়নি। ১৭৯১ সাল থেকে রুগ্ন আতুর ইউরোপীয় সেনাদলের স্বাস্থ্যালয়—স্যানাটোরিয়াম হয়। পাহাড়ের মাথায় ঐ ফোর্ট দেখতে সেবার যখন যাই, এক জায়গায় তখন বোর্ডে লেখা দেখেছিলাম,—ওখানে শেষ ইউরোপীয় রুগ্ন সৈনিকের মৃত্যু হয় ১৯০৩ সালে। পাহাড়ের মাথাটার বিস্তার অনেকখানি। খানিক অংশে সেনাবাসও ছিল, আর একটা অংশ কারাগার ভাবেও ব্যবহার হোত। ১৮৯০ সাল থেকে সেনাবাস এখানে থেকে তুলে নেওয়া হয়। তারপর ওখানে প্রতিষ্ঠিত হোল ছেলেদের রিফর্মেটারী স্কুল—সংশোধনাগার বিদ্যালয়। ১৯৪১ সালে যখন যাই—তখনও তাই ছিল।

জানি না, এখন ওখানে কী হয়।—আর এই যে অতো কাণ্ড ঘটে গেল ঐ পাহাড় নিয়ে—এ-সবেরই নির্বাক সাক্ষী আমাদের এই মা ভাগীরথী!

মাঝিরা দাঁড় ছেড়ে বজরার ছাতের নিকটে আসে। ছাতের ওপর লম্বা-করে-রাখা পাল তোলার বাঁশ। সেই বাঁশ তুলে পাল খাটায়। বাতাস উঠেছে। পালে বাতাস লেগে ফুলে ওঠে,—ডানা মেলে যেন রাজহাঁস উড়তে ওঠে। বজরাও সবেগে জল কেটে চলতে থাকে। আশপাশের নৌকাগুলিও পাল তুলে দেয়। পাহাড়ের মাথায় দুর্গের প্রাকার ও ঘরবাড়ি আরও স্পষ্ট হয়। দেখতে দেখতে পিছনে পড়ে থাকে।

তীরের অল্প দূর দিয়ে বজরা এগিয়ে চলে।

তরুচ্ছায়াস্নিগ্ধ গঙ্গার ঘাট। ঘাটের উপর বাড়িঘর। ঘাটে কয়েকটি নৌকা বাঁধা। অল্প এগিয়ে যেতেই ফেরি-ঘাট। ছায়াবটের তলে পারের যাত্রী দল। ঘাটে দাঁড়িয়ে ঢাউস ফেরি-নৌকা। তখনও লোক উঠছে। শশব্যস্ত যাত্রীদল। অবাক হয়ে দেখি, শুধু মানুষই ওঠে না,—সাইকেল, ঘোড়াও! ওকী! এক্কাগাড়িও তুলছে! পাল নামিয়ে আমাদের মাঝিরাও বজরা ঘাটে লাগায়। দুজন মাঝি নেমে যায়,—বোধ হয় ঘাটের দোকানে কিছু কিনতে চলেছে। শেষকিরণও আমার দিকে তাকিয়ে—'আমিও এখনি ঘুরে আসছি'—বলে লাফিয়ে ঘাটে নামে। ঘাটে ফেরিওলার কাছে কি কিনে তখনি আবার ফিরে আসে। হাসি মুখে বলে, চীনে বাদাম!—হাতের চেটোতে ভেঙে খোসা ছাড়িয়ে আমাকে দেয়, বলে, দুটো খান্ না, ভাল লাগবে,—বেশ মুচ্‌মুচে,—গরম ভাজছে,—একটু নুন নিন্,—নাঃ, এতে লঙ্কার গুঁড়ো মেশানো নেই!

মাঝি দুজনও ফিরে আসে। আবার বজরা ছাড়ে। লোকজনের কর্ম-ব্যস্ত জীবন মনকে ক্ষণিক দোলা দিয়ে আবার দূরে সরে যায়। বজরা

এগিয়ে চলে ধীর মন্থর গতিতে গঙ্গার শান্তনির্জন জলপথে।

দূরে পশ্চিম আকাশ জুড়ে দেখা যায় বিন্ধ্যপর্বতের দীর্ঘ শৈলশ্রেণী। পাহাড়ের মাথা সমতল। তাই দেখায় যেন পশ্চিম দিগন্তব্যাপী এক সুদীর্ঘ প্রাচীর গাঁথা। পাহাড়ের পাদদেশে গাছপালা,—সবুজের সমারোহ। আসন্ন সন্ধ্যার শান্তস্নিগ্ধ শ্যামল প্রলেপ মাখা।

শেষকিরণ মাঝি-সর্দার বদরীকে জিজ্ঞাসা করে, রাত কাটাতে নৌকা কখন নোঙর করবে,—আরও এগিয়ে? বদরী বলে, না, আজ আর বেশী দূর যাব না। এখানে পাড়ের নিকট করব না—নদীর মধ্যে মাঝামাঝি এগিয়ে,—পাড় থেকে খানিক দূরে। নইলে রাত্তিরে চুরি-ডাকাতির ভয় আছে। এসব অঞ্চল ভাল নয়, বিশেষ করে আরও একটু এগোলে মির্জা-পুরের কাছে।

কিন্তু মাঝগঙ্গা পর্যন্ত যেতে হয় না। কিছুদূর যেতেই মা গঙ্গা যেন আঁচল পেতে দেন। নদীর বুকে চড়া। বজরার গতি রোধ হয়। তুজন মাঝি সেই শীতে জলে নামে। বদরীও লগি নিয়ে ঠেলাঠুলি করে। বজরা মুক্ত করতে কষ্ট পায়। তারপর স্রোতে ফিরে আরও খানিক নদীর মাঝা-মাঝি এগিয়ে নোঙর ফেলা হয়।

আমাদের তৃতীয় রাতও সেখানে কাটে,—নির্বিঘ্নে।
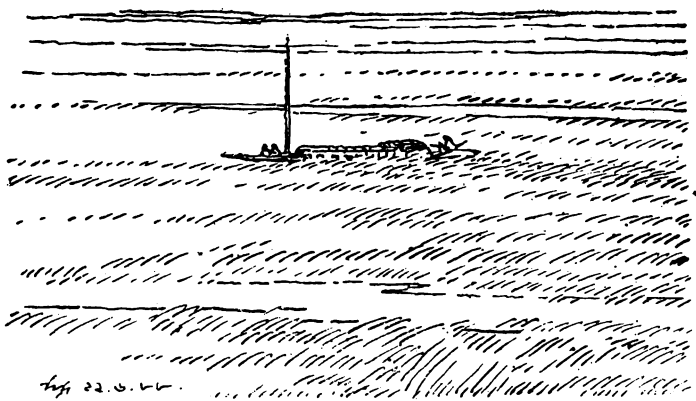
॥ আট ॥

ভোরবেলা। বজরা আবার কখন চলতে শুরু করেছে। দাঁড়ের জল-কাটার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ নেই। মাঝিদেরও গলা শোনা যায় না।

শেষকিরণ উঠে জানলা খুলে মুখ বাড়িয়ে দেখে। বলে, ওঃ! গুণ টেনে চলেছে।

রোদ উঠলে ছাদে গিয়ে বসি। সেইখানেই প্রাতরাশ হয়। নদীর দক্ষিণ তটের নিকট দিয়ে বজরা চলে। একটা বড় গ্রাম আসছে দেখা যায়। দেখতে দেখতে এসেও যায়। গ্রামের ভাঙা ঘাট। তীরে স্তূপাকার বড় বড় পাথরের slabs। বোঝা যায়, প্রসিদ্ধ চুনারের পাথর। বিন্ধ্যগিরি থেকে এখানে এনে জড় করে রাখা। নদীপথে চালান যাবে।

মাঝিরা ঘাটে বজরা ভিড়ায়। গঞ্জের নাম শুনি, সিনোরী। ঘাটের একটু উপরে সাধুর কুটির। সাধুজি গঙ্গাস্নান সেরে ঘাট থেকে উঠছেন। পিঠে কাঁধে ছড়ানো জটা। পরনে কৌপীন। হাতে কমণ্ডলু।

ওপরে দোকান পাট দেখা যায়। মাঝিরা কেনাকাটা করতে নামে!

শেষকিরণও নেমে যায়। হাতে ঝোলা,—আবার তখনি বজরায় ফেরে। বলে, একটা ঘটিও নিয়ে যাই,—যদি দুধের সন্ধান মেলে।

বলি, নামছ,—আবার তাড়াতাড়ি ফিরো যেন,—কাশীর মত কোরো না।

ফিরে আসে দেরী না করেই। হাসিমুখে। বলে, দুধটা খাঁটিই পেলাম মনে হয়,—তবে মোষের দুধ। দশ আনা সের। জ্বাল দিয়ে দু'কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে আসি। কি বলেন? শীতের সকালে রোদে বসে খাওয়া যাবে।

বলি, ভালই তো। ঝোলা ভরতি অতো কী নিয়ে এলে?

নানা রকম টাট্‌কা সব্‌জি পেলাম,—নিয়ে এলাম। আলু, বেগুন কপি, বীন্‌, টমাটো, গাজরও পেলাম। দেখুন না,— কী রকম 'ফ্রেশ'। ভাল কথা, আপনার ব্যাগ্‌-এ সেলাই-এর কৌটায় সূঁচটা দেখেছি, মুখে একটু মরচে পড়েছে। তাই একটা নতুন আনলাম। বাজারে ঢুকেই দেখি দরজির দোকান। সূঁচ দিয়ে কোনোমতেই পয়সা নিতে চায় না। বলে, 'বাবু, এর আবার দাম দেবেন কী!' আমিও তীর্থপথে বেরিয়ে দান নেব কেন? পাঁচ পয়সা দিলাম।

আমি বলি, তা ভালই করেছ, কিন্তু অতো সব্‌জি,—নষ্ট হবে না?

সে বলে, শীতকাল,—নদীর ওপর,—শুকোবে কেন? গঙ্গামায়ি শুকতে দেবেন কেন? সব্‌জির বাজার দেখে সত্যিই যা আনন্দ হচ্ছিল! এর জন্যেই গঙ্গার ধারে যাদের বাস তাদের কখনো দুর্ভিক্ষ হয় না,—আর অতো গ্রাম শহর লোকবসতি গঙ্গার দুই পাড়ে। এ যেন মায়ের কোলে বাস!—উৎসাহ ভরে কথাগুলি বলতে বলতে নিচের ঘরে ঢোকে। জানি, সব্‌জিগুলি সেখানে এককোণে সাজিয়ে রাখবে। তারপর, কফিও আনবে। মাঝিরাও এসে যায়। ওদিকে বাতাসও ওঠে। মাঝিরা ঘরের ছাদে শুইয়ে-রাখা বাঁশ টেনে বার করে। পাল খাটায়। বজরা পাল তুলে চলতে থাকে। হেলে-দুলে। মাঝিদের এখন বিশ্রাম। একজন শুধু হাল ধরে বসে।

গঙ্গার শান্ত রূপ। বহুদূর অবাধ দৃষ্টি যায়। আমাদের বাঁদিকে এখন উঁচু পাড়। ডাইনে নদীর বুকে চড়া। তারই উপর কোথাও মাঝে মাঝে সবুজ ঘাস, কোথাও বা ভিজা বালির সোনালী প্রলেপ। কিছুদূর এগিয়ে গঙ্গার প্রধান স্রোতধারা ঘুরে যায়,—বজরাও তাই ধরে নদীর অপর পাড়ে পাড়ি দেয়। তীরের কাছাকাছি চলে আসে।

নদীর এ-পাড়েও গ্রাম। নাম শুনি,—রামগড়। গাছপালার মধ্যে মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। ঘণ্টাধ্বনিও কানে আসে। আমাদের সামনে ও

পিছনে আরও কয়েকটি নৌকা। সবারই পাল তোলা। হালকা ছিপছিপে নৌকাগুলি পিছন থেকে এসে হু হু করে পাশ দিয়ে এগিয়ে যায়। একটা নৌকায় দুটি বালক আমাদের বজরা পিছনে পড়ে থাকায় মহা উৎসাহে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে থাকে।

সেদিনও চরে নেমে স্নান। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম। মধ্যাহ্নের সুমধুর স্তব্ধতা দেহমন ছেয়ে রাখে। বজরা চলে ধীরে ধীরে।

ওদিকে আকাশে কখন মেঘ দেখা দেয়। ক্রমে রাশি রাশি কালো মেঘ আকাশ ঘিরে ফেলে। এলোমেলো বাতাস বয়।

বিকালের দিকে টিপ্‌টিপ্‌ করে বৃষ্টি নামে। শেষকিরণ ঘরের ভিতর জানলার পাশে বেঞ্চে বসে। একমনে বাইরে তাকিয়ে। আমি পাটাতনে শতরঞ্চিতে বসে বই পড়ি। আমাকে ডাকে, বলে, কী অতো বই পড়-ছেন? উঠে এখানে এসে বসে দেখুন না,—কী সুন্দর দেখাচ্ছে! নদীর বুকে বৃষ্টির ধারা পড়ে চারদিকে যেন খই ফুটছে!

উঠে গিয়ে জানলার ধারে বসি। বৃষ্টিধারার ঝালরের মাঝ দিয়ে বজরা চলে। সামনের দৃশ্য আবছায়া হলেও নদীর অপর দিকে—গঙ্গার দক্ষিণ তটে অস্পষ্ট ছায়ার মত দেখা যায়—বহু বাড়ি ঘর।

শেষকিরণ বলে, নিশ্চয় মির্জাপুর-এ এসে গেলাম।

বজরার গতিও এখন সেই অভিমুখে। শহরের ঘরবাড়ি ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে থাকে। বৃষ্টিও আপাততঃ থামে। শেষকিরণ বলে, দেখছেন? শহর এল, অমনি আধুনিক সভ্যতার কলকারখানার চিম্‌নি, টাওয়ার—আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে! উঁচু জলের-ট্যাংকও দেখা যাচ্ছে!

শহর আরও এগিয়ে আসে। খুব উঁচু পাড়। মনে হয়, নদীবক্ষ থেকে ত্রিশ চল্লিশ ফুট ওপরে। পাড়ের ওপর সারি সারি বাড়িঘর। কোন

কোনটার অংশ নদীগর্ভে ভেঙে পড়েছে। ভগ্নাংশ নিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে। চার-পাঁচটা বড় পাকা-বাঁধানো ঘাট। সেখানেও কোন কোন ঘাটের অংশ ভাঙা। ভাঙা ঘাটের পাথরের ওপর ধোপারা আছড়ে আছড়ে কাপড় কাচছে। নিকটে দাঁড়িয়ে তাদের বাহন,—কয়টা গাধা। ঘাটের উপর মন্দির। ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসে।

আর একটু এগুলে গঙ্গার উপর পারাপারের পুল। কয়েকটা নৌকা বজরা দাঁড়িয়ে।

আমাদের বজরা শহরের এ-পাড় ছেড়ে অপর পাড়ের দিকে এগিয়ে নোঙর করে। পুলের ধারে। বদরী জানায়, আজ এইখানে থাকতে হবে। কাল পুল খুললে তবে আবার এগুতে পারা যাবে। অস্থায়ী পুল—Fair weather bridge। সারি সারি ভাসন্ত লোহার পিপা—উপবৃত্তাকার (elliptical)—বড় বড় বয়া-র ওপর জলযানের গতিপথ রোধ করে পারাপারের সেতু। পুলের গায়ে লোহার মোটা শিকলের রেলিঙ। বর্ষা-কালে মাসতিনেক পুল সরিয়ে রাখা হয়। বছরের অন্য সময় প্রতিদিন বেলা ছুটো থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত নৌকা, বজরা যাতায়াতের জন্য পুলের খানিকটা অংশ ডানদিকে খুলে সরিয়ে রাখে। সেখানে বড় লঞ্চের মত ছুটো স্টীমার সারাক্ষণ নোঙর করে রাখা। পুলের ও জলযান যাতা-য়াতের তত্ত্বাবধান ও প্রহরার জন্য। পুলের একদিকে মির্জাপুরের শহরের ঘাট, অপর পাড়ে চিল্ ঘাট—মিটার গেজ্ রেল স্টেশন। বেনারসের দিক থেকে N. E. Rly-র ছোট রেলের যে লাইন চলে গেছে এলাহাবাদ—তারই ওপর মাধো সিং জংশন স্টেশন থেকে গঙ্গার এই ধার পর্যন্ত চিল্-এ এসেছে এই শাখালাইন,—মাত্র পনেরো মিনিট-এর রেলযাত্রা।

আবার বৃষ্টি নামে। শেষকিরণ বলে, এই বৃষ্টির মধ্যেও পুলের ওপর অনবরত লোকজন যাতায়াত করছে। আমি বলি, শুধু পায়ে হেঁটে কেন? গরুর গাড়ি, এক্কাও যাতায়াত করছে।

তবে দেখি, যান-চলাচল করে one way—'একমুখী' প্রথায়।

অপরিসর সেতু,—তাই পুলের দুই মুখে ঘণ্টাধ্বনির সংকেত দিয়ে গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

জানলার ধারে বসে দুজনে সেই প্রবহমাণ জনস্রোত দেখতে থাকি। কদিন শান্ত নির্জন জলপথে এসে এখন এই লোকাকীর্ণ কোলাহলমুখর কর্মব্যস্ত জগতের দৃশ্য কেমন যেন বিসদৃশ বোধ হয়।

রাত অবধি বৃষ্টি চলে। তারপর ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘের অন্তরাল থেকে একসময়ে চাঁদের হালকা জ্যোৎস্না চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কেমন যেন ঘোলাটে আলো। শিশুর মুখে যেন কান্নার পর মৃদু হাসি, ফোলা ফোলা গালে চোখের জলের রেখা,—তারই মাঝে হাসির আভাস।

অনেকগুলি বজরা একে একে এসে আশেপাশে নোঙর করে। প্রায় গায়ে গায়ে লাগিয়ে। মাঝিতে মাঝিতে চেঁচিয়ে গল্প করে।

রাত্রের খাওয়াদাওয়া সেরে দুজনে শুয়ে পড়ি। আমাদের মাঝিরাও পাশের ছোট কামরায় এসে শোয়। শুনতে পাই, বদরী তাদের রূপকথার গল্প বলে,—রাজা, রাণী, রাজপুত্তুর, রাজকন্যে, রাক্ষস,—আসর জমিয়ে। ঠাকুরমার ঝুলির কাহিনীর মতন!

শেষকিরণ চাপা গলায় বলে, শুনছেন? এখানেও এদের মধ্যে এর প্রচলন! কিন্তু, শুনতে বেশ লাগছে,—ছোট ছেলেদের মত কেমন শুনছে সবাই!

আমরাও সেই রূপকথা শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়ি।

॥ নয় ॥

ভোরে ঘুম ভাঙে।

এখনও আকাশ মেঘে ভরা। তবে বৃষ্টি নেই। বেশ শীত। নদীর ওপর,—হবারই কথা। ভাগ্য ভাল, হাওয়া নেই। পুলের উপর দিয়ে লোকজনের যাতায়াত শুরু হয়। ছাদে বসে আমরা দেখি। হঠাৎ শেষ-কিরণ উৎফুল্ল হয়ে ডাক দেয়,—বদরী! বদরী!

'কী হোল?'

দেখতে পাচ্ছেন না। পুলের ওপর দিয়ে সাইকেল চড়ে গ্রামবাসীরা শহর পানে চলেছে,—'কেরিয়ারে' দুধের কেঁড়ে! নিশ্চয় দুধ বিক্রী করতে!

বদরীর সাহায্যে দুধ কেনা হয়। দাম নিল,—এক টাকায় এক সের।

বয়ার গা দিয়ে নেমে লোকজন গঙ্গাস্নান করে,—সুর করে রামনাম গান করে।

বেলা হলে আমাদের মাঝিরাও চলে বাজার করতে।

শেষকিরণ বলে, আমিও ঘুরে দেখে আসি।

পাড় থেকে দূরে আমাদের বজরা দাঁড়িয়ে, তবে পুলের নিকটে। পাশাপাশি এতো নৌকা, বজরা গায়ে-গায়ে লেগে দাঁড়িয়ে,—যে সহজেই সেই সব নৌকার ওপর দিয়ে গিয়ে বয়ার গায়ে ওঠা যায়, ওখান থেকে পুলের ওপর পৌছানো। পুলের শেষে খাড়া পাড়ের ওপর ওঠবার ইট-বাঁধানো রাস্তা। তারপর পাড়ের মাথায় নদীর তীর ধরে পথ। তাকিয়ে দেখতে থাকি,—সেইভাবে পুলে উঠে উপরের পথে পৌছে শেষকিরণ কোথায় অদৃশ্য হয়।

এগারোটার আগেই সে ফিরে আসে। উৎসাহ ভরে গল্প করে, বেশ বড় শহর। নদীর তীর ধরে ওপরে ঐ যে রাস্তা—তার দুধারেই বাড়িঘর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। তার পর এগুতেই পেলাম বড় রাস্তা। সেখানে শহরে যেমন হয়ে থাকে,—বহু লোকজনের ভিড়। বড় বড় মসজিদ। বাজার হাট। প্রচুর তরিতরকারি বিক্রী হচ্ছে—বড় শহরের তুলনায় সস্তাও। আলু—টাকায় তিন সের। ফুলকপি—বেশ বড় বড় সাইজের—টাকায় তিন চারটে। বেগুন বলল—দু আনা সের। টমাটো—চার আনা। পেয়ারাও—চার আনা, দেখতে হলুদ রঙ্—যেন পাকা, অথচ ডাঁসা,—চমৎকার খেতে! ক'টা নিয়ে এলাম, দেখবেন খেয়ে?

আমি হেসে বলি, তুমিও সেখানে খেয়েছ তা হলে?

সে বলে, কলের জলে ধুয়ে তবে খেলাম,—নুনও চেয়ে দোকানে পেলাম। মুদির দোকানেও দর জিজ্ঞাসা করলাম, গম—টাকায় পাঁচ পোয়া। চাল, ডাল, বাজরা—তাও টাকায় এক সের/পাঁচ পোয়া। বদরী দেখলাম বাজরা কিনছে,—বলেছে আজ আমাকে বাজরার রুটি খাওয়াবে। আপনিও একটা খেয়ে দেখবেন,—কীরকম উপাদেয়! আমি বলি, তুমি খেয়ো—আমি একটুকরো চেখে দেখতে পারি,—তবে বেশি খাওয়া ভরসা করি না,—ওসব গুরুপাক। সে বলে, মির্জাপুর শুনেছি কার্পেটের জন্যে প্রসিদ্ধ, কার্পেট-কারখানাও অনেকগুলি দেখলাম। দোকানেও বিক্রী হচ্ছে, একটাকে ঢুকে দাম জিজ্ঞেস করলাম,—সাধারণ উল্-এর ৩৫ টাকা বর্গগজ (sq. yard), ভাল জিনিস ৫০ টাকা sq. yd.।

হাট বাজারের সংবাদ জানিয়ে শেষকিরণ বলে, আপনি স্নান করবেন কোথায়? আমি ওধারে ঐ বয়ার ওপর দিয়ে গঙ্গায় নেমে স্নান করে আসি।

বলি, অনেকেই তাই করছে দেখছি, সাবধানে করে এস। আমি বজরা থেকে বালতি করে জল তুলে বাইরে স্নান সেরে নেব। তুমি দেরি কোরো না যেন,—রান্না সব তৈরি।

খাওয়াদাওয়া সেরে ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া হয়। হঠাৎ বাইরে শোনা যায়, বেশ চেঁচামেচি, হইচই। শেষকিরণ উঠে বাইরে যায়। ফিরে এসে জানায়, কত নৌকা, বজরা চারদিকে জড় হয়েছে! শুনলাম, পুলের কর্মকর্তাদের পীড়াপীড়ি করছে, তাড়াতাড়ি পুল খুলে দিতে। দুটার আগেই সম্ভবতঃ আজ পুল খুলবে।

সওয়া একটাতেই অবশেষে পুল খুলে দেয়—মির্জাপুরের পাড়ের অল্প দূরে খানিক অংশ। শেষকিরণকে বলি, দেখে মনে পড়ছে, কলকাতায় এখনকার নতুন বড় হাওড়ার পুল হবার আগে,—নীচু, ছোট পুল ছিল। তখন সেখানেও স্টীমার ও বড় বড় নৌকা যাতায়াতের জন্যে এইভাবে পুলের খানিক অংশ মাঝে মাঝে খুলে দেওয়া হোত,—কবে কতোক্ষণ সেই ভাবে হাওড়ার পুল খোলা থাকবে, খবরের কাগজে তার বিজ্ঞপ্তি বার হোত। হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরতে বা ট্রেনে ফিরে আসতে সেই নোটিশ দেখে তবে আমাদের যাওয়া-আসার দিনস্থির করার নিয়ম ছিল,—সেকালে!

শেষকিরণ বলে, দেখুন, দেখুন,—এখানে পুল খোলা পেয়ে কী কাণ্ড বাঁধল!

তাকিয়ে দেখি, নৌকা ও বজরাগুলির মাঝিদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে,—কে আগে পার হতে পারে! ফলে, বজরা ও নৌকাগুলি ধাক্কাধাক্কি করে জটলা পাকিয়ে শহরের রাস্তায় ট্রাফিক-জ্যাম্-এর মতন এখানে নদীপথে জলযান-জটের সৃষ্টি করেছে! কেউ-ই এগুতে পারে না। মাঝিদের চিৎকার, কলহ, হট্টগোল! পুলের উপর পুলিস ও অফিসাররা দাঁড়িয়ে চেষ্টা করেন সামলাতে। অযথা সময়ও যায়।

তারপর, তাঁদেরই সামনে একসময়ে সব জলযানই পুলের অপর দিকে পৌঁছায়। আমরাও মুক্তিপ্রাপ্তির স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ি।

আকাশ পানে তাকিয়ে দেখি, কখন মেঘও কেটেছে। নীল আকাশ। বিকালের রূপালী রোদ ফুটেছে। গঙ্গার আঁকাবাঁকা গতিপথ। নদী এখানে বেশি চওড়া নয়। আমাদের বজরা মাঝগঙ্গা দিয়ে চলেছে। শেষকিরণ বলে, মনে হচ্ছে, যেন এতক্ষণ একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম,—এখন জেগে উঠেছি।

বজরার অদূরে জলে এক ঝাঁক বুনো হাঁস। নিশ্চিন্ত মনে সাঁতার কেটে চলেছে। হঠাৎ জল ছেড়ে ডানা মেলে উড়ে অল্প দূরে গিয়ে আবার জলে ভাসে। হালকা সোনালী রঙ্‌—ডানায় কালো বর্ডার। ভাসতে ভাসতে কলকণ্ঠে ডাক ছাড়ে। শেষকিরণ অস্ফুটে বলে, "বকের পাখায় আলোক লুকায় / ছাড়িয়া পুবের মাঠ।"

আমি মন্তব্য করি, এও তো এখন যেন সুখস্বপ্ন দেখা!

নদীর বাম তটের দিকে দেখা যায় আট ন'টা বজরা। নানা রঙের, —কোনটা নীল, কোনটা সবুজ, কোনটা লাল। বদরী বলে, ওরা সবাই কাশী থেকে চলেছে প্রয়াগের কুম্ভতে ভাড়া খাটতে।

আমাদের বজরাও নিয়ে চলে নদীর সেই পাড়ে। সবাই চলেছে গুণ টেনে। আমাদের মাঝিরাও গুণ নিয়ে নেমে পড়ে। দল বেঁধে সোৎসাহে চলতে থাকে।

গঙ্গার স্রোতধারা আবার বেঁকে যায়। নদীর বাম তীর ছেড়ে দক্ষিণ তীর পানে বজরা চলে। সেদিকে খাড়া উঁচু পাড়। নদীর ধারে চলে এসেছে বিন্ধ্যগিরি। পাহাড়ের মাথায় কোথাও শিলাস্তূপ, কোথাও বা গাছপালা। বাড়িঘরও দেখা দেয়। বিন্ধ্যাচল তীর্থক্ষেত্র এসে যায়। খেয়াঘাট পেরিয়ে এসে ভেঙে-পড়া বিশাল প্রাচীন ঘাট। প্রকাণ্ড সব পাথরের চাঁই,—slabs পড়ে,—এধারে ওধারে। বড় বড় গাছের ছায়ায়

অতীতের কীর্তি যেন তার কঙ্কালসার দেহখানি নিয়ে আকুল নয়নে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে,—সেখানে নদীর বুকে অর্ধমগ্ন এক ভাঙা স্তম্ভ।

নদীর পাড়ে মন্দির, পাকা বাড়িঘর, লোকজন। নিকটেই বিন্ধ্যপর্বতের অনুচ্চ গিরিশ্রেণী। সেখানেও পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি পাকা বাড়ি, মন্দির।

শেষকিরণ তাকিয়ে দেখে মন্তব্য করে, হিমালয়ের কথা ভাবলে, এটা দেখায় যেন একটা টিলা!

আমি হেসে বলি, তবে এ পাহাড়ও দীর্ঘ প্রসারিত। পুরাকালে এই পর্বতই শ্রেষ্ঠ বলেও গণ্য হোত। দেবতারাও এখানে বিহার করতেন। তারপর নারদ এসে তাঁকে একদিন যা বললেন, তোমার মন্তব্যও আজ শোনাল অনেকটা তাই। সে কাহিনী তোমার জানা নেই? নারদ বিন্ধ্যকে বললেন, সুমেরু পর্বত তোমার চেয়ে মহান্ বলে গর্ব করেন, কেন না সূর্য সেই পর্বত পরিভ্রমণ করেন।—বিন্ধ্য অমনি সেই গর্ব খর্ব করার উদ্দেশ্যে সূর্যের গতিরোধ করার জন্যে শিখর-গুলির মাথা উঁচু করতে লাগল। ফলে জগতের অর্ধেক হয়ে গেল অন্ধকার, আর অপর অর্ধেক সারাক্ষণ রৌদ্রতাপে দগ্ধ হতে থাকল। দেবতারা মহাদেবকে গিয়ে ধরলেন। তিনি বললেন, এর প্রতিকারের পরামর্শ দিতে পারবেন বিষ্ণু। বিষ্ণুর কাছে গেলে তিনি বললেন, যাও বিন্ধ্যর গুরু অগস্ত্যমুনির কাছে। তিনি এর প্রতিবিধান করবেন। অগস্ত্য বিন্ধ্যর কাছে আসতেই শিষ্য মাথা হেঁট করে যেই প্রণাম করলেন, গুরু আদেশ দিলেন, এইভাবেই তুমি থাক যতোক্ষণ না আমি দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে আসি। তিনি সেদিক থেকে আর ফিরলেন না, বিন্ধ্যও চিরকাল তাই মাথা হেঁট করেই এইভাবে রয়েছেন,—গুরুর আজ্ঞা পালন করছেন।

শেষকিরণ হেসে বলে, মনে পড়ছে বটে কাহিনীটা শুনেছি।—পাহাড়ের ওপর নাকি মায়ের বহু প্রাচীন গুহামন্দির আছে? প্রয়াগ থেকে ফেরবার সময় নেমে দেখতে গেলে হয়।

আমি বলি, ভাল কথাই। আমারও ওখানে দর্শনে যাওয়া কতোকাল আগে—সেই ১৯১৬ সালে। ফেরবার পথে আবার দর্শন করার ইচ্ছা রইল। জানো তো, বিন্ধ্যবাসিনী এ-অঞ্চলের ডাকাতদেরও আরাধ্যাদেবী,—খুব নাকি জাগ্রতা!

শেষকিরণ বলে, আর শুনেছি তো এ-অঞ্চলে ডাকাতির আশঙ্কাও খুব।

এখন আর বজরা এখানে ভিড়ানো হয় না।

তবে কদিন পরে কাশীতে ফেরবার সময়, ঘাটে বজরা লাগিয়ে, পাহাড়ে উঠে মন্দির দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা হয়।

তীরের অল্প দূর দিয়ে বজরা এগিয়ে চলে। শুধু আমাদেরটাই নয়। আরও কয়েকটি। সব বজরাই এখন নিয়ে চলেছে গুণ টেনে। মাঝিরা গুণ কাঁধে সারি সারি চলেছে দল বেঁধে। কখন বালির চড়ার ওপর দিয়ে, কখনো বা দল্‌দলে কাদা ভেঙে, কখনও আবার নদীর জলের মধ্যে ছপ্‌-ছপ্‌ করে পা ফেলে,—সে-জল কোথাও কোথাও তাদের হাঁটু ছাড়িয়েও উঠছে। পাড়ের নিকট জল আরও বেশি গভীর হলে ডাঙার উপর উঠে গুণ টেনে চলে। সেখানে আবার সরষের ক্ষেত,—নদীর পাড় অবধি এগিয়ে আসে। সেই ক্ষেত ভেদ করে এগিয়ে চলা। সবুজ চারা, মাথা-ভরা সরষের হলুদ-ফুল, মাঝিদের কাঁধে গুণ-টানার লগুড়, ঝুঁকে-পড়া দেহ, ঘনক্ষেতের চারাগুলি একহাতে সরাতে সরাতে—যেন চিরে চিরে পথ করে চলতে থাকে। মাঝে মাঝে আবার পলি-মাটির খাড়া উঁচু পাড়, নিচে নদীর স্রোত। পাড়ের গায়ে ফাটল,—এক এক জায়গায় ফাটা-অংশ ভেঙে ঝুপ্‌ঝাপ্‌ শব্দ করে নদীবক্ষে পড়ে। মাঝিরা সে-সব স্থান এড়িয়ে অতি সাবধানে এগুতে থাকে।

শেষকিরণ একমনে কবিতা আওড়াচ্ছিল, "এ নদীর জলটুকু টল্‌মল করে / এ নদীর ধারে রে ভাই বালি ঝুর্‌ঝুর্ করে…" হঠাৎ থেমে যায়।

মুখে তার বিস্মিতা ফুটে ওঠে। বলে, দেখছেন? বেচারী মাঝিদের কী কঠিন পরিশ্রমই না করতে হয়! ওভাবে চলার বিপদও আছে।

বলি, যেমন তোমাদের হিমালয়-অভিযানে হঠাৎ-পাহাড়-ধসে-পড়ায় বা তুষার-অঞ্চলে avalanche—হিমানী-সম্প্রপাত, বরফের ফাটল—crevasse!

শেষকিরণ উল্লসিত হয়ে বলে ওঠে, হিমালয়ের কথা বলছেন, আর ওদিকে তাকিয়ে দেখুন,—বিন্ধ্যপাহাড়ের পিছনে আকাশের দিকে! নীল মেঘের মাথায় কীরকম জ্বলজ্বল করছে সাদা রঙ্-এর ছটা! দেখাচ্ছে, ঠিক যেন হিমালয়ের তুষার-শিখর, আর দিগন্ত জুড়ে গিরিশ্রেণী,—আর, এই বিন্ধ্য হোল যেন তার foothill—পাদশৈল!

তাকিয়ে দেখি, দিগন্তে প্রকৃতই যেন দূর-থেকে-দেখা হিমালয়! শুধু তাই নয়। সেই মেঘপুঞ্জের অন্তরালে কোথায় সূর্যাস্ত হচ্ছে, তারই রক্তিম ছটায় সেই মেঘরাশির শুভ্র শীর্ষ ক্রমশঃ উজ্জ্বল স্বর্ণবরণ ধারণ করে,—এগিকে গঙ্গার জলেও সেই রাঙারঙের আভা ছড়িয়ে পড়ে!

দুজনে নির্বাক হয়ে দেখতে থাকি, দিনশেষে গঙ্গাবক্ষে সূর্যাস্তের অপরূপ শোভা। দিনের আলো নেবার আগেই চাঁদ ওঠে। ধীরে ধীরে জ্যোৎস্নায় ভরে যায় চারিদিক, যেন স্বর্ণজাল ছড়িয়ে পড়ে জলে স্থলে—দিগ্‌দিগন্তে!

মাঝিরা নৌকায় উঠে দাঁড় টানে। বজরাগুলি এ-পাড় ছেড়ে নদীর মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলে। রাত অবধি চলতে থাকে। রাত নয়টার পর নোঙর করে।

নিকটে নদীর বুকে চড়া। নির্জন নীরব। কোথাও কোন জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। অদূরে দেখা যায় নদীর তটভাগ। মাটি-বালির কূলভূমি চাঁদের আলোয় দেখায় যেন শ্বেতপাথর-বাঁধানো বড় ঘাট। তীরে গ্রাম নেই। সুবিস্তীর্ণ ঘন কোমল সবুজ ক্ষেত। এই নিঃশব্দ জনশূন্যতার উপর আসন পেতে যেন শুভ্রবেশ শুভরাত্রি নিস্তব্ধ হয়ে যোগাসনে বসে!

অপর বজরাগুলিও এসে যায়। আশেপাশে নোঙর করে। সেই শব্দহীন চরভূমি মাঝিমাল্লাদের কলরোলে মুখরিত হয়ে ওঠে। ধ্যানমগ্না প্রকৃতি যেন চমকে ওঠেন।

বহুকাল থেকে মির্জাপুরের গঙ্গার এইসব অঞ্চলে ডাকাতির কুখ্যাতি আছে। আজও তাই কাশীর বজরা নৌকা সব দল বেঁধে একই জায়গায় নোঙর করে রাত কাটায়।

মনে পড়ে, প্রায় দেড়শ বছর আগে কলকাতার লর্ড বিশপ Reginald Heber ১৮২৪ সালে বজরা করে এই নদীপথে উত্তর ভারতে আসেন এবং তাঁর সেই জলযাত্রার অপূর্ব বিবরণ লিখে যান Narrative of a journey through the Upper Provinces of India বইখানিতে। সেখানেও এ-অঞ্চলের দুর্নাম দেখা যায়। তখনও সব বজরা এখানে দল বেঁধে রাত কাটায়।

আবার আমাদের যাত্রার দু'বছর আগে ১৯৬৩-৬৪ সালে Eric Newby যখন গঙ্গাবক্ষে জলযাত্রা করে এই অঞ্চল দিয়ে যান, তিনিও তাঁর Slowly down the Ganges বইখানিতে এখানকার ঐ একই অপবাদ লিখে যান।

দলবদ্ধ হয়ে থাকায় বিপদের আশঙ্কাও কম থাকে, নিশ্চিন্তে রাতও কাটে। আমাদেরও প্রয়াগ যাওয়ার পথে তাই কেটেও ছিল।

কিন্তু, কদিন পরে প্রয়াগ থেকে কাশীতে ফেরবার সময়ের এই অঞ্চলের অভিজ্ঞতার বিবরণও এইখানে দিই।

কুম্ভমেলা থেকে ফিরতির পথে দেখা যায়, কাশীর বজরা নৌকা দল বেঁধে একই দিনে বা একই সঙ্গে ফেরে না। যে যার সুবিধা মত যাত্রা করে। কেউ কেউ হয়ত আরও রোজগারের আশায় প্রয়াগে দু'চারদিন

দেরী করে। তাই, ফেরবার পথে এ-অঞ্চলে ডাকাতির ভয় আরও বেশি থাকে। তা ছাড়া, মাঝিদের কাছে প্রয়াগে রোজগার করা থোক মোটা টাকা থাকার কথাও। এই কারণেই হয়ত, আমরা প্রয়াগে থাকা-কালে আমাদের বজরার মালিক বিশ্বনাথ কাশী থেকে ট্রেনে প্রয়াগে আসে। আমাদের ফিরতি-পথে যাত্রার আগে তাদের উপার্জিত টাকা নিয়ে ট্রেনেই আবার কাশী ফিরে যায়। আমাদের বজরাও নদীপথে যাত্রা শুরু করে। এ-ব্যবস্থায় বিশ্বনাথের অর্থহানির আশঙ্কা কাটে বটে, কিন্তু আমাদের ও মাঝিদের মনে ডাকাতের আক্রমণের ভয় ভাবনা ও অস্বস্তি দূর হয় না। তাই, মির্জাপুরের এই ভয়াবহ অঞ্চল পার হওয়ার সময় মাঝিদেরও দুশ্চিন্তা থাকে।

সেই কুখ্যাত অঞ্চল দিয়ে সেদিন আমরা ফিরছি। দিনের আলোয় মানুষের মনে ভয় থাকে না। মাঝে মাঝে অন্যান্য নৌকা, নদীর পাড়ে লোকজনও, দেখা যায়। কিন্তু, রাত্রের অন্ধকার নামলে? তার উপর, সেদিন সারাবেলা আকাশে মেঘের ঘনঘটা। সন্ধ্যা নামতেই ঘনান্ধকার। যেন, নিষুতি রাত! আকাশ ও নদীর জল, যেন, একাকার। শুরু হয় টিপ্‌টিপ্‌ করে বৃষ্টি। এলোমেলো বাতাস। শীতও পড়ে তেমনি। লণ্ঠন জ্বালিয়ে গায়ে কম্বল জড়িয়ে আমরা দুজন বজরার কামরার মধ্যে বসে গল্প করছি। বজরা চলেছে দাঁড় বেয়ে। বদরী এসে জানায়, আজ রাতে বজরা কোথাও নোঙর করা চলবে না। সারারাত চালিয়ে যাওয়া হবে,—কোথাও আর কোন নৌকা বা বজরা দেখা যাচ্ছে না,—আমরা একাই চলেছি। আপনারা কামরার দরজা জানলা বন্ধ করে খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়ুন।—তাই করাও হয়।

কিন্তু শয্যাগ্রহণ করলেও চোখে ঘুম নামে না। দুজনে ফিস্‌ফিস্‌ করে গল্প করি। কামরার এক কোণে প্রতিদিনের মত লণ্ঠনের আলোটা কমিয়ে রাখা,—সারারাত ঐ ভাবেই জ্বলবে। বাইরে জলে দাঁড় ফেলে-চলার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। মাঝিদের দু'একটা অস্ফুট কথা-বার্তা। তারই

মধ্যে দুজনে কখন ঘুমিয়েও পড়ি।

মাঝরাতে দরজার বাইরে হঠাৎ বদরীর চাপা গলায় ডাক,—'বাবু! বাবু!'—ঘুম ভেঙে যায়। শেষকিরণ তড়াক্ করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। দরজা খোলে। বদরী চুপি চুপি বলে, ঘরের ঐ আলোটুকুও নিবিয়ে দিন। একেবারে অন্ধকার করে রাখুন। টর্চও জ্বালাবেন না। কোন শব্দও করবেন না,—কথাবার্তাও বলবেন না। কিছুদূরে একটা নৌকো আসছে—জোরে চালিয়ে,—নিশ্চয় ডাকাতদের! যান—দরজা এখনি বন্ধ করুন—আলোটাও নেবান।

সেইমত করে শেষকিরণ এসে বিছানায় বসে। আমিও উঠে বসেছি। অন্ধকার ঘর। নৌকা চলেছে। তবে দাঁড় ফেলার শব্দও শোনা যাচ্ছে না,—যেন পা টিপে টিপে নৌকা চলে!

শেষকিরণ ফিস্‌ফিস্ করে বলে, মনিব্যাগটা কোথায়? দিন্।

বালিশের তলা থেকে বার করে দিই।

নোটগুলো বার করে নেয়। কয়েকটা টাকামাত্র তাতে থাকে। তার-পর ব্যাগ ফেরত দিয়ে উঠে যায়। কামরার কোন্ কোণে একটা কাঠের খাঁজে একটু ফাঁক দেখেছিল—সেইখানে নোটগুলি গুঁজে রেখে দিয়ে আসে। তারপর যেন নিশ্চিন্ত হয়ে চুপিচুপি বলে, ডাকাত আসুক,—ব্যাগে-রাখা ঐ কটা টাকা নিয়ে যাক্। বলব, কুম্ভতে সব খরচ করে এলাম,—যাবার সময় এলে না কেন?

দুজনে আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ি। ঘুম আর আসে না। কেবলি মনে হয়, এই বুঝি ডাকাতের ডিঙি এসে লাগল—হুড়মুড় করে ডাকাত এসে পড়ল!

এই ভাবেই সময় কাটে, রাতও পোহায়। ডাকাত আর আসে না!

সে-ঘটনা প্রয়াগ থেকে ফেরবার পথে। এখন যাবার সময় এই সব অঞ্চলের কুখ্যাতির প্রচার আছে জানলেও মনে ডাকাতির ভয় বা ভাবনা

জাগে না। এতোগুলি বজরা পাশাপাশি নোঙর করে থাকা,—অতো লোকজন,—অমন ফুটফুটে জ্যোৎস্না। চাঁদের কিরণে তারাগুলিও নিষ্প্রভ দেখায়। মনে হয়, যেন ভোর হয়ে এল।

রাত্রে আজ শীতও কম বোধ হয়। নিশ্চিন্ত মনে গভীর ঘুমে রাত কেটে যায়।
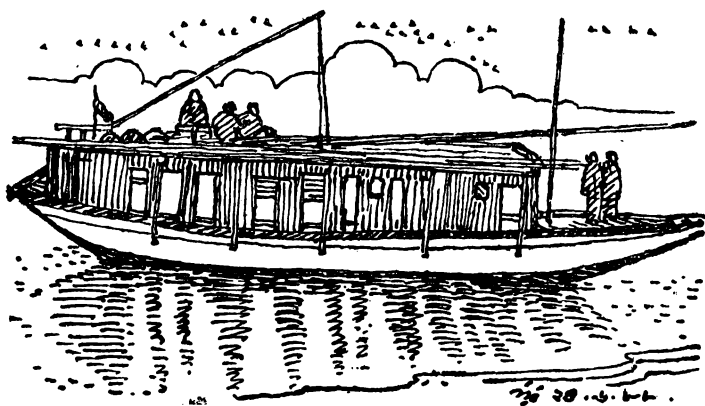
॥ দশ ॥

ভোরে বজরাগুলি কখন চলতে শুরু করেছে জানতে পারি নি। রোদ উঠলে ছাদে গিয়ে বসা হয়।

গঙ্গার বাম তটের নিকট দিয়ে বজরা এগিয়ে চলে। বেশ বড় গ্রাম আসে।

শেষকিরণ বদরীকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করে, ই কোন্ গাঁও হ্যায় ?

বদরী বলে, গোপীগঞ্জ !

নাম শুনে আমি বলি, ওঃ! এই গোপীগঞ্জ! সমৃদ্ধ গ্রাম শুনেছি। এরই উত্তরপূর্ব অঞ্চলকে বলে ভাদোহী—Bhadohi। সেখানে একশ্রেণী আদিবাসীর বাস—তাদের 'ভর' (Bhar) বলে পরিচয়। ভারতের পশ্চিম অংশ থেকে আর্যরা যখন প্রথম এদিকে এগিয়ে আসেন তখন নাকি এই আদিবাসীদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ বাধে। রাজপুত ও মুসলমানদের আগে এই ভর-আদিবাসীদেরই এ-অঞ্চলে আধিপত্য ছিল। শুনেছি, এখনও উত্তরপ্রদেশের এ-অংশে এরা এক বড় সম্প্রদায়।

শেষকিরণ মন্তব্য করে, তখনও কী জানি, গঙ্গা হয়ত এমনি করেই বইতেন! নামও তাই অনন্ত-প্রবাহিনী! দেখতে দেখতে গোপীগঞ্জ পিছনে পড়ে থাকে। কিছু পরে আবার আর এক গ্রাম। নাম শুনি গোপালপুর। বেলা বাড়ে। নদীর ধারে তাই লোকজনও বেশি। ছোট ছেলেমেয়েরা স্নান করতে জলে নেমেছে। কৌতূহলী হয়ে সকলে বজরার দিকে তাকায়। বজরা এগিয়ে চলে। তারা একদৃষ্টে দেখতেই থাকে।

হঠাৎ অল্প বাতাস ওঠে। মাঝিরা উৎসুক হয়ে পাল খাটানোর চেষ্টা করে। কিন্তু পালের যোগ্য হাওয়া নয়। অগত্যা নৌকা থেকে পাড়ে

নামে। গুণ টেনে নিয়ে চলে।

আজও দুপুরে মাঝগঙ্গায় চড়ার কাছে নোঙর করা, স্নান, খাওয়া-দাওয়া। শেষকিরণ বলে, কী চমৎকার দিনগুলি! এই শীতকালে এমন রোদের মধ্যে গঙ্গাস্নান, চরে বসে খাওয়া,—বাসন মাজারও কতো সুবিধে—হাতের কাছেই জল!

বিকালেও আজ গুণ টেনে চলা। শীতের শীর্ণকায়া নদী। দিকে দিকে চর। স্রোতধারার বাঁকও অনেক। কখন বাঁদিকে, কখন ডানদিকে চরভূমি অথবা নদীর তীর আসে।

রাত আটটায় পাড় থেকে অল্প দূরে নোঙর করা হয়। নদীতটে বন-প্রান্ত ছায়ায় গ্রাম। মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনিও ভেসে আসে।

শেষকিরণ বলে, গঙ্গার ধারে ধারে যেমন গ্রামের পর গ্রাম, তেমনি গ্রাম থাকলেই মন্দিরও।

এদিকে নদীর ধারেও বুনো হাঁসের কলধ্বনি। আজও অপূর্ব জ্যোৎস্না। একটু পরে শিয়ালেরও ডাক শোনা যায়। ঝিল্লীরবও কানে আসে। রাতের কোন্ এক পাখিও হঠাৎ ডেকে ওঠে!—বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনি। প্রকৃতির এই বিচিত্র ঐকতান চোখে ঘুম ডেকে আনে।
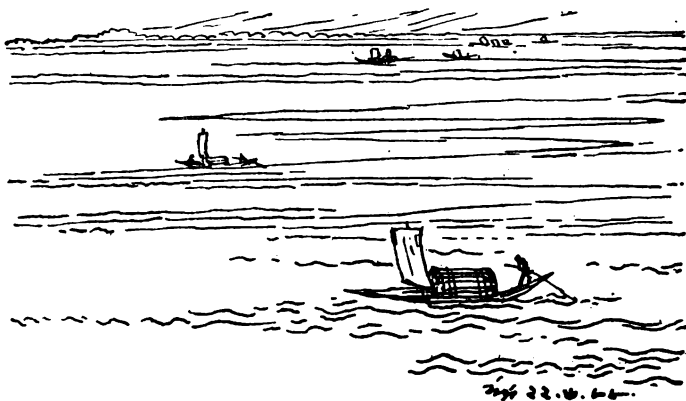
॥ এগারো ॥

আজও সারাদিন বজরা চলে কালকের মত। কখন নদীর বাম তীর ধরে, কখন মাঝগঙ্গায় চরের ধার দিয়ে। প্রায়ই গুণ টেনে চলা। বেলা হলে চরে নেমে স্নান, রোদে আরামে বসে খাওয়া দাওয়া সারা। তারপর আবার যাত্রা।

এদিকের চরগুলি কোথাও কোথাও কাদাভরা। বোধ হয়, শীতকালে নদীর জল নেমে গিয়ে সে-সব স্থান এখনও সম্পূর্ণ শুকায় নি। পাখির ঝাঁকও দিকে দিকে। ছোট বড়,—নানা আকারের, নানা জাতির। সম্ভবতঃ, কর্দমাক্ত চরে কীটপতঙ্গের সন্ধানে ঘোরে ফেরে। চারিদিকে কাদার উপর, এমন কি বালুতটেও, পাখির পায়ের ছাপ নক্‌শার মত দেখায়। আজ নদীর পাড়ে, জলের বুকেও প্রায়ই পাখি দেখা যায়।

শেষকিরণ সারাদিন সেই সব পাখি দেখতেই ব্যস্ত। চরে নেমে স্নান করার আগে কিছুক্ষণ তো পাখিদের পিছু পিছু ছুটাছুটি করেই কাটাল।

এখন বজরা চলেছে। ছাতে বসে অনুযোগ করে, সালিম আলির পাখির বইটা সঙ্গে আনেন নি কেন? বর্ণনা পড়ে, ছবি মিলিয়ে কেমন চমৎকার পাখিগুলিকে চেনা যেত!

হেসে বলি, ওরাও তাহলে তোমার পরিচয় নিয়ে আলাপ জমাত? কিন্তু, তুমি যে হঠাৎ কাশীতে এসে যোগ দেবে,—তা তো ভাবি নি। আমার চোখ মন নিয়ে আসা,—বইপত্তরের দরকার কী!

মনে মনে ভাবি, ওকে বোঝাব কী করে, আমার এই ভ্রমণের "কাছে কিছুই নেই জরুরী, বর্তমানের নোঙর-ছেঁড়া ভেসে-যাওয়া" আমার এই দিনগুলি!

হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে, বজরার অদূরে,—শেষকিরণকে বলি, দেখ, দেখ,—কী সুন্দর!—সামনে এক ঝাঁক পাখি, স্রোতে কেমন সাঁতার কেটে ভেসে চলেছে—মনের আনন্দে!—আরে! নিশ্চয় আমাদের বজরা আসার সাড়া পেল! ঝাঁক বেঁধে জল ছেড়ে উড়ে, আর একটু এগিয়ে, আবার বসল জলের ওপর!

শেষকিরণ উল্লসিত হয়ে বলে, আর লক্ষ্য করলেন, উড়ে গেল, জলে নামল ঠিক এরোপ্লেনের মাটিতে 'ল্যাণ্ড' করার মতন! প্রথমে গুটিয়ে-রাখা দুই পা খুলে জলে নামায়, তারপর জলে পা ঠেকিয়ে ছড়ানো-ডানায় জলে কিছুদূর এগিয়ে যায়। শেষে ডানা গুটিয়ে স্থির হয়ে সাঁতার কাটে, দেখায় যেন ভেসে চলেছে—অথচ স্রোতের প্রতিকূলে! পাখিগুলির রঙ্ নজর করেছেন? গায়ের রঙ্ বাদামী, ডানার মাঝখান সাদা,—তার চার-পাশ চওড়া কালো রঙের বর্ডার। একটু সবুজও আছে। লেজের দিকটাও কালো। আবার গলা সাদা, অথচ ঠোঁট ও পা দুটো কালো। আকারে বড় সাইজের মুরগির মতন!—কাগজে লিখে রাখি, ফিরে গিয়ে বইখানাতে মিলিয়ে দেখতে হবে,—কী পাখি।

বলি, এই পাখি বোধ হয় সেদিনও দেখেছিলাম!

শেষকিরণ জলযাত্রা থেকে ফিরে গিয়ে পাখিদের কথা ভোলে না। আমাকে জানায়, ওদের পরিচয় পেয়েছি। নাম,—Brahminy duck—ব্রাহ্মণী হাঁস। এরা পরিযায়ী—migratory পাখির দল। শীতের শুরুতে এ-দেশে আসে, আর গরম পড়ার আগে—মার্চ-এপ্রিলে ফিরে যায়। মে-জুন মাস এদের প্রজননের সময়,—সে সময় থাকে দক্ষিণ ইউরোপে, উত্তর আফ্রিকায়, মধ্য এসিয়ায়। আমাদের দেশের নিকটতম প্রজনন স্থান হলো—লাডাক ও তিব্বত। বারো থেকে ষোল হাজার ফুট উঁচুতে! আপনি হয়ত এদের দেখে থাকবেন মানসসরোবর অঞ্চলে। এদের নাম 'ব্রাহ্মণী' রাখা হোল কেন জানি না। এরা আমিষাশী,—এমন কি মরা জীবজন্তু পর্যন্ত খেতে নাকি দেখা গেছে! আমরা যখন তাদের দেখেছি—অমন

সূর্দের ভেসে বেড়াতে, তখন হয়ত মাছের সন্ধানেই ঘুরছিল! এদের স্বভাবও অতি বিচিত্র। আমাদের দেশে যখন এসে থাকে তখন এরা উগ্র প্রকৃতির, কাউকে কাছে আসতে দেয় না, সামান্য সাড়াশব্দ পেলেই উড়ে দূরে সরে যায়,—আমরাও সেদিন গঙ্গার বুকে যেমন দেখেছিলাম। অথচ, প্রজনন স্থানে—যেমন তিব্বতে, এই পাখিরাই আবার অতি শান্ত নিরীহ স্বভাব,—তিব্বতীদের ঘরের ছাতে বসে, ঘরেও ঢোকে, কাছাকাছি ঘোরে। জানি না, আপনি এদের সেখানে কি রকম দেখেছিলেন। এ দেশে এসে এ-পাখিদের অমন ভিন্ন প্রকৃতি হওয়া আশ্চর্য মনে হতে পারে, কেন না, ও-পাখি শিকার করে এখানে কেউ খায় না,—এদের মাংস মোটেই নাকি সুস্বাদু নয়। কিন্তু, আর এক মজার কথা, আমাদের ভাষায় এদেরই নাম চকা-চকী! আর চক্রবাকের দাম্পত্য প্রেমের কাহিনী চিরপ্রসিদ্ধ! তাই, আমার ধারণা, দাম্পত্য প্রেমের দিনগুলি কাটাতে আমাদের দেশে আসা,—দূরে একান্তে সরে যাওয়া, বিরক্ত করলে উগ্র মেজাজ! নয় কী?

শেষকিরণের বিবরণ পড়ে তাকে জানাই, তিব্বতে ও-পাখিদের শান্তই দেখেছি,—ওদের স্বভাব সম্পর্কে তোমার মতামত প্রকাশ করে এখন একটা 'থিসিস' লিখে ফেল!

বিকেলে আরও কিছু দূর এগিয়ে বজরা নোঙর করা হয়। আজও অন্য সব বজরা, নৌকা একে একে আসতে থাকে। একই জায়গায় জড়ো হয়ে রাত কাটায়। বদরী জানায়, এ-সবই খারাপ জায়গা, এখনও দু'একদিন এইভাবে কাটাতে হবে।

মনে মনে ভাবি, গঙ্গার কোলে প্রকৃতির এমন শান্তিময় রাজ্যেও এ কী অবাঞ্ছিত অশান্তির উদ্বেগ!

॥ বারো ॥

ভোরে ঘুম ভাঙে। পাঁচটা বেজেছে। মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াই। শীতের ভোর। চাঁদ অস্ত গেছে। দিনের আলো ফোটে নি। আকাশে তারাগুলিরও সভা ভাঙে নি। উত্তরে সপ্তর্ষিমণ্ডল ও পুবে শুকতারা এখনও জ্বল্‌জ্বল্‌ করে।

ঘরে ফিরে এসে বসি। দূরে কোথা থেকে শিয়ালের ডাক শোনা যায়। শেষকিরণ চা তৈরী করে। মৌজ করে চা খেয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে ছাতে যাওয়া হয়। তারাগুলি এতক্ষণে নিষ্প্রভ হয়ে আসে। পুব দিগন্তে ক্রমশঃ লালচে আভা ফোটে। কে যেন সেদিকে অলক্ষ্যে বসে রঙের আরও প্রলেপ দিতে থাকেন,—গোলাপী আভা ক্রমে রক্তবরণ হয়ে ওঠে। নদীও যেন সেই রঙে তার জলের শাড়ি রাঙিয়ে নেয়। তীরে কোথায় মন্দিরে ঘণ্টা বাজে। ওদিকে নদীর বামতীরে রঙের আর এক খেলা। ধান বা গমের খেতের সবুজ রঙ্‌, কোথাও সরষে খেত,—সেখানে সরষে ফুলের হলুদ বরণ!

বাইরে বেশ কন্‌কনে শীত। কিন্তু ওকী! অমন পরিষ্কার দিনের সূচনা,—অথচ, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার জল থেকে চারিদিকে ঘন কুয়াশা উঠতে থাকে! নদীর বুকে মেঘের মত জমে ওঠে। মাঝে মাঝে তাতে ফাঁক,—দেখায় যেন কোন কারিগর গঙ্গার উপর চতুর্দিকে কুজ্‌ঝটিকার প্রাসাদ গড়ার কাজে মত্ত,—কোথাও স্তম্ভের আকার, কোথাও খিলানের রূপ—আকাশের মেঘের মতন বিচিত্র নানান্‌ আকৃতি। তেমনি ক্ষণস্থায়ীও। অল্পক্ষণের মধ্যেই চারিদিকের কুয়াশা ঘনীভূত হয়ে একাকার হয়। আকাশে যেমন ঘন মেঘ ছেয়ে ফেলে, তেমনি এখানে

দেখি এই শীতের সকালে গঙ্গার বুক ঘনঘোর কুয়াশার নিবিড় আবরণে ঢাকা পড়ে যায়। বজরা থেকে কয় হাত দূরেও আর কিছুই দেখা যায় না। বজরা যেন ঘেরাটোপে ঢাকা পড়ে। সেই নিশ্ছিদ্র কুয়াশা ভেদ করে মাঝে মাঝে বুনো হাঁসের ডাক শোনা যায়। দূরে কোথায় শিয়ালও ডেকে ওঠে।

শেষকিরণ বলে, এ যে দেখি, অমন নির্মল সকাল কোথায় পালিয়ে রাত নামল!

কুয়াশার গাঢ়ত্বের কারণে যাত্রারও বিলম্ব হয়। ক্রমশঃ কুয়াশা কিছুটা কাটলে বজরাগুলি আবার চলতে শুরু করে।

কিছুদূর দাঁড় টেনে গিয়ে গুণ টানা শুরু হয়। পাঁচটা বজরা কাছাকাছি চলেছে। সব কটাই গুণ টেনে। ফলে, গুণের দড়িতে দড়িতে জড়িয়ে যায়। দেখে, শেষকিরণের মহাস্ফূর্তি, বলে, এ তো আকাশে ঘুড়ির পেঁচ!

সব বজরাই দাঁড়িয়ে যায়। গুণটানা মাঝিদের মধ্যে হাসাহাসি,—এবার ওধার পরস্পরে ঘোরাঘুরি করে দড়ির জট খোলে। ছাড়াতে সময়ও যায় অনেকক্ষণ।

বেলা দশটা নাগাদ নদীর বাঁ পাড়ে একটা গ্রামে বজরা দাঁড়ায়। শেষকিরণ বলে, দেখি, যদি দুধ পাই।—ঘটি-হাতে নেমে যায়। হাসিমুখে ফিরে আসে। বলে, পেয়ে গেলাম—এক সের। এক টাকা নিল।

এদিকে আমাদের মাঝিরাও একটা জেলের নৌকা থেকে সওদা করছে। শেষকিরণ জিজ্ঞাসা করে, কী কিনছ?

বদরী তুলে ধরে দেখায়,—মছ্‌লী!

শেষকিরণ প্রশ্ন করে, কেয়া ভাও?

"আট আনা মে দো ঠো।"

শেষকিরণ অবাক হয়ে আমাকে বলে, দুটো বড় সাইজের ইলিশ! চার আনায় এক-একটা! একেবারে টাটকা, গঙ্গা থেকে তোলা!

আমি বলি, তাতে তোমারই বা কী, আমারই বা কী? দুজনেই মাছ খাই না। বিশপ হেবরের এই অঞ্চলে গঙ্গায় মাছ কেনার গল্প শুনবে? তিনি এই জলপথে যেতে এখানে গঙ্গায় মাছ কিনেছিলেন একদিন—প্রায় সের দশেকের একটা কাৎলা বা রুই কিছু হবে—ছয় আনায়!—আর একটা জেলের নৌকো থেকে কেনেন, বিশপের দলের প্রায় চল্লিশ জনের—খাওয়ার মত মাছ—½ ক্রাউন দিয়ে—অর্থাৎ মাত্র টাকা দুই দিয়ে! সে-ঘটনা অবশ্য ১৮২৪ সালে—আজ থেকে ১৪২ বছর আগে!

শেষকিরণ বলে, এ-সব শোনায় যেন রূপকথা!

আমি বলি, আজ মাঝিরাও যে-দরে কিনল, শহরে ফিরে গিয়ে গল্প করলে শুনতে মনে হবে রূপকথা!

ওদিকে বজরা দেখে গ্রামের কয়টা বাচ্চা ছেলে পাড়ের ওপর ছুটে আসে। জড়ো হয়ে দাঁড়ায়,—পরস্পরে কী-সব বলাবলি করে। কুতূহলী দৃষ্টি নিয়ে এদিকে তাকায়।

শেষকিরণ অনুশোচনা করে, খুব ভুল হয়েছে, লজেন্স কিনে আনলে হোত। ওরা পেলে কেমন খুশি হোত!

আবার বজরা চলতে থাকে। মাঝিরা সারি সারি গুণ টেনে চলেছে। গুণের টানে সামনে হেলে-পড়া দেহ, মুখে পড়ছে সূর্যের কিরণ। বালিঝুর্‌ঝুরে উঁচু পাড়। রোদ পড়ে ঝিক্‌মিক্ করে সোনার মতন। ফাটল ভেঙে বালির পাড় মাঝে মাঝে জলে পড়ে। সেখানে উঁচু পাড়ের গায়ে বালির বিভিন্ন স্তর দেখা যায়।

বজরা কখনো পাড়ের নিকটে আসে, কখনো বা কিছু দূরে সরে যায়।

আবার একটি ছোট্ট গ্রাম,—ছবির মত। বজরা যেন আপন মনে এগিয়ে চলে,—ক্ষণিক দেখা গ্রামখানি আবার চোখের আড়ালে লুকায়।

কিছুদূর যেতে আবার আর এক গ্রাম। বদরী বলে, খয়রা-বসরা গাঁও।

দেখে মনে হয়, এদিকের কিছুটা বড় গ্রাম। নদীর ঘাটেও লোকজন।

অল্প দূরে জলের নিকটে কয়টা হাঁস। বজরা তাদের কাছাকাছি আসতেই সব কয়টা নদীর উপর দিয়ে জল ছুঁয়ে উড়ে আসে। লম্বা গলা বাড়িয়ে, বড় বড় ডানা মেলে তাদের আসা দেখে মনে হয় যেন খেলা-ঘরের প্লেন। আমাদের বজরার উপর দিয়ে সেই পাখির ঝাঁক বন্‌বন্‌ শব্দ করে উড়ে যায়। অদূরে নদীর বুকে একটা চড়ায় নেমে গিয়ে বসে।

ডানপাশে নদীর ধারে শ্মশান। ছড়ানো পোড়া কাঠ। ভাঙা কলসী। দু একটা চিতার ভস্মাবশেষ। একদল লোক, কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে। একজন নাপিতকে দিয়ে ক্ষৌরকর্ম করাচ্ছে। দুজন নদীতে স্নানে নেমেছে। মুখ ফিরিয়ে সবাই বজরার দিকে তাকায়।

বজরা আপন লক্ষ্যে এগিয়ে চলে।

বেলা আরও বাড়লে বাতাস ওঠে। নদীর জলে ছোট ছোট ঢেউ দেখা দেয়। একটা বাঁকের কাছে পৌঁছলে পরিশ্রান্ত মাঝিরা গুণ গুটিয়ে নৌকায় ওঠে। বজরায় পাল খাটায়।

বদরী এসে জানায়, আজ হাওয়া উঠেছে ভাল। পাল তুলেই বজরা চলতে থাকবে সারাক্ষণ! দাঁড়াবে না কোথাও।

তাই আজ দুপুরে বজরাতে দাঁড়িয়ে নদী থেকে বালতি-বালতি জল তুলে স্নান, বজরার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া সারা হয়।

বজরা সারাদিন পাল তুলে আপন বেগে চলতে থাকে।

নৌকার মধ্যে বসে গঙ্গার কতো আঁকাবাঁকা গতি তা বোঝা যায় না। আকাশে সূর্যের দিকে তাকালে, তবে দিক্ নির্ণয় হতে পারে। গত দুদিন এসেছি পশ্চিম মুখে। আজ অনেকক্ষণ চলেছি দক্ষিণ মুখে, তারপর

কিছুক্ষণ পশ্চিম মুখে গিয়ে উত্তর দিকে চলা, পরে আবার ঘুরে গিয়ে পশ্চিমে !

শেষকিরণই এ-সব লক্ষ্য রাখছিল, বলে, এ আর পারছি না, মাথা ঘুরে যাচ্ছে,—এ যেন চরকি বাজি !

আমি বলি, কিন্তু নৌকার মধ্যে বসে এতো ঘোরাঘুরি বোঝাই যায় না একটুও।

নদীর অতো বাঁকের জন্য ও জলস্রোতের বিভিন্ন ধারার বেগ বুঝে বজরাও চলতে থাকে কখনও গঙ্গার ডান, কখনও বাঁ তীর ধরে, আবার কখনও মাঝনদী দিয়ে। এই ভাবে সারাদিন চলে সন্ধ্যার আগে নদীর বাম কূলের কিছু দূরে বজরা নোঙর করা হয়। অদূরে উঁচু পাড়ের ওপর গ্রামও দেখা যায়।

আরও দুটি বজরা এসে পাশে দাঁড়ায়। ওদিকে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে। দিনের শেষ আলোর আভা জ্যোৎস্নার মাঝে কখন মিলিয়ে যায়, জলে স্থলে দিগ্‌দিগন্তে চাঁদের কিরণ ছড়িয়ে পড়ে।

পাশের বজরার মাঝিরা ঢোল বাজিয়ে রামনাম শুরু করে দেয়। আমরাও ঘরে নেমে যাই। আমাদের বজরার মাঝিরাও রামনামে যোগ দেয়। গান একসময়ে শেষ হলেও তাদের মজলিস ভাঙে না। অনেক রাত অবধি তাদের খাওয়া-দাওয়া, গল্পগুজব চলতে থাকে।

॥ তেরো ॥

সকালে চলতে শুরু করে বজরা পাড়ের নিকট দিয়ে যায়। উঁচু পাড়। মাঝে মাঝে নদীগর্ভে ভেঙে পড়া। পাড়ের কিনারায় গ্রাম। বাড়িঘরের দেওয়ালের রঙ্‌ গঙ্গার মাটির রঙের সঙ্গে একেবারে মিল। খোলার চাল-গুলিতে লালরঙের খাপরা—মাটির গেলাসের আকার। পাশাপাশি ঘন বাড়ি। যেন, ভিড় করে নদীর উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে। শুধু বাড়িই নয়, লোকজনেরও জটলা। তাকিয়ে দেখে বজরাগুলিকে। কেউ কেউ চেঁচিয়ে কৌতূহলী প্রশ্ন করে, কাঁহা সে আ রহল্‌ বা? কাঁহা জায়েকে বা হো?

মাঝিরাও উত্তর দেয়, বনারস্‌কে বজরা,—প্রয়াগ কুম্ভ্‌ চল্‌তা।—কেমন যেন একটু গর্বের সুর!

বজরা এগিয়ে চলে।—গ্রামবাসীদের মধ্যে বাচ্চাদের সংখ্যাই বেশি। তাদের উৎসাহ ও উত্তেজনাও উদ্দাম। দুরন্তপনাও আছে। দু'একটা দুষ্টু ছেলে ঢিল তুলে বজরা লক্ষ্য করে ছোঁড়ে। এতদূরে পৌঁছয় না। গঙ্গার জলে ঝুপ্‌ করে পড়ে। মাঝিরা হাসে।

গ্রামের দিক থেকে কোথায় ময়ূরের ডাক শোনা যায়। কর্কশ কেয়া-ধ্বনি। হয়ত গ্রামের খেতে ঘুরছে। বদরী বলে, এ-সব অঞ্চলে এককালে প্রচুর ময়ূর ও হরিণ ছিল।

শেষকিরণ উত্তেজিত হয়ে বলে, পাড়ের ওপর ওদিকে নিশ্চয় বড় রাস্তা। সারি সারি উট চলেছে!

তাকিয়ে দেখি, তাই বটে।—মাথা গলা দুলিয়ে, লম্বা লম্বা পা ফেলে।

পাড়ের ওপর একটা পাকা বড় বাড়ি। নিকটে বইপত্তর হাতে ছাত্রের দল। নিশ্চয় স্কুল-বাড়ি।

বজরার ছাতে বসে তীরের পানে চেয়ে থাকি। বজরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। তবু মনে হয়, আমরা নিশ্চল, ছুটে চলে পাড়ের ঐ বাড়ির পরে বাড়ি,—সামনে আসে, পিছিয়ে চলে যায়, দূরে সরে আড়ালে হারায়।

এক জায়গায় এক সাধুর কুঁড়ে ঘর। ঘরের সামনে দণ্ডে টক্‌টকে লাল ধ্বজা,—বাতাসে উড়ছে। তারই পাশ দিয়ে উঁচু পাড়ের গা বেয়ে পায়ে-হাঁটা সরু পথ নিচে গঙ্গায় নেমে এসেছে।

খাড়া পাড়ের গায়ে খোপ খোপ মতন। যেন, পাহাড়ের গায়ে সব গুহা। পাড়ের ওপর ভাঙা দুর্গের প্রাকারের মত অংশ।

বদরী বলে, এইখানে পাণ্ডবদের মারবার উদ্দেশ্যে লাক্ষাঘর তৈরী করে দুর্যোধন। জায়গার নামও তাই লছ্‌ছাগীর।

শেষকিরণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকায়। বলে, সে কী! এই-খানে জতুগৃহ! হিমালয়ে উত্তরকাশীর নিকটে তো জতুগৃহ—লক্ষাঘর দেখায়!

আমি বলি, সত্যিই সেটা ঘটেছিল কিনা বা কোথায় ঘটেছিল তা কি কেউ জানে? তাই ঘটনার বর্ণনার সঙ্গে কোন জায়গার কিছু মিল পেলেই তখনি সেই জায়গার প্রচার হয়ে যায়। আর, সেইখানে দাঁড়িয়ে দেখতে ভাবতে মনে একটা আমোদও পাওয়া যায় না কি?

হঠাৎ নদীতীরের শান্ত পরিবেশ কাঁপিয়ে রেলের বাঁশী বেজে ওঠে। ট্রেন যাওয়ার ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ আসে। চমকে দুজনে পাড়ের সেদিক পানে তাকাই। রেলগাড়ি দেখা যায় না। শব্দ শুনে বোঝা যায়,—গ্রামের ঐ দিক দিয়ে কোথাও রেলপথ, একটা ট্রেনও চলেছে।

বদরীকে প্রশ্ন করে জানা যায়, ওটা সেই মিটার গেজ্‌ লাইন,—ওধারে 'হাণ্ডিয়া টিশন'!

বজরা চলতে থাকে। আরও কিছুদূর এগিয়ে পাড় থেকে অল্পদূরে চরের ধারে নোঙর করা হয়। ঐখানেই আজ দুপুরের স্নান আহার।

বিকালে আবার যাত্রা। সারাপথে কেবলি সেই বুনো হাঁস দেখা যায়। বজরাগুলি তাদের শান্তি ভঙ্গ করে, উড়ে উড়ে গিয়ে দূরে জলে ভাসে। তীক্ষ্ণ স্বরে ডাক ছেড়ে তাদের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশের প্রতিবাদ জানায়।

রাত্রে নির্জন চড়ার ধারে নোঙর পড়ে। সব বজরা পাশাপাশি। মাঝিরা আজ হারমোনিয়াম, ডুগি তবলা, খঞ্জনি, ঢোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান-বাজনার জমজমাট আসর পাতে।

ওদিকে চাঁদও ওঠে। বিরাট আকার। সোনার থালার মতন—প্রায় গোলাকার। নদীর বুকে ধীরে ধীরে কুয়াশাও উঠতে থাকে। জ্যোৎস্না ও কুয়াশায় মিলে অপূর্ব মায়ারাজ্যের সৃষ্টি করে। জ্যোৎস্নাস্নাত রজনী যেন লাজভরে সিক্তবসনে মুখ ঢাকে।
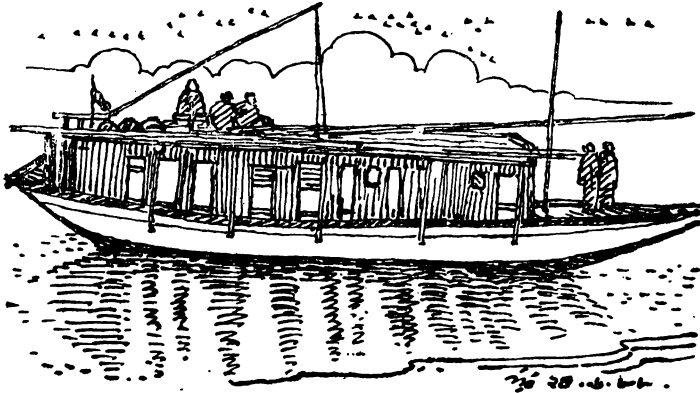
॥ চোদ্দ ॥

ভোরে ঘুম ভাঙে। বাইরে আসি। চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা। নদীর কোন্ দিকে পাড় দেখা যায় না। কিছু সেই ঘন কুয়াশার আবরণ ছিন্ন করে সূর্যোদয় হয়। তখনও পশ্চিম আকাশে ম্লান্ চাঁদ অস্তমিত হয় নি। বজরা চলতে শুরু করে।

মাঝিরা গুণ টেনে নিয়ে চলে। কুয়াশার মধ্যে আব্ছা ছায়ার মত তাদের দেখায়, কখনও বা সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়।

ক্রমশঃ বেলা বাড়ে। কুয়াশাও কাটে। নদীর বুকে যেখানে জল কম, লম্বালম্বি জেলেদের মাছধরার জাল পাতা। যেন পথের ওপর বেড়া দেওয়া। এক জায়গাতেই নয়, দিকে দিকে। সেই সব জালের বেড়া এড়িয়ে পথ করে বজরা এগিয়ে নিয়ে যেতে সময় লাগে, মাঝিদেরও বিরক্তি জাগে।

ক্রমশঃ নদীর স্রোত বাড়তে থাকে। দাঁড় টেনে বজরাও নিয়ে আসে গঙ্গার দক্ষিণ পাড়ের দিকে।

সেখানে বড় গ্রাম। নাম শুনি সির্সা।

পাকা বাঁধানো ঘাট। এক সাধু গঙ্গাস্নানে নেমেছেন। ঘাটের ওপর ঐ তাঁর আশ্রম,—গেরুয়া কাপড় ঝুলছে। তীরে রোদে বসে কয়টি ছাত্র বই পড়ে, মুখ তুলে বজরার দিকে তাকায়।

সির্সার নদীর পাড় কাঁচা, খুব ভাঙাও। গঙ্গা এখানে উত্তর দিক থেকে হঠাৎ একেবারে পুবে বাঁক নিয়েছে। কিন্তু পাড়ে এত ভাঙন ও নদীর এমন স্রোতের কারণ অদূরে টন্স্ নদী গঙ্গায় এসে মেশে।

গ্রামের ঘাট ছাড়িয়ে এসে পাড়ের নিকটে নোঙর করা হয়। তীরে

মাঠ জুড়ে সরিষার খেত। হলুদ ফুলের বন্যা। মাঝিরা নেমে বাজারে যায়। শেষকিরণও বলে, আমিও যাই, ঘুরে আসি, যদি দুধ পাই দেখি।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসে। বলে, বেশ বড় জায়গা, বাজারও বড়। মাইল তিনেক দূরে বড় লাইনের রেল স্টেশন। দেহাত হলে হবে কী, কাশী বা মির্জাপুরের চেয়ে জিনিসপত্তরের দাম বেশি। দুধ এক সের পেলাম,—এক টাকা নিল।

এইখানেই স্নান আহার সারা হয়। তারপর আবার যাত্রা।

এগিয়ে গিয়ে এ-পাড় ছেড়ে বজরা মাঝগঙ্গার দিকে পাড়ি দেয়। কিন্তু অল্পদূর গিয়ে আর এগুতে পারে না। গঙ্গার বাঁকে—সঙ্গমের নিকটে প্রচণ্ড খরস্রোত। ভুল করে বজরা সেইখানেই এসে পড়ে। মাঝিরা সবাই মিলে দাঁড় টানতে বসে যায়। বজরা তবু জল কেটে এগোয় না। ঢেউ তুলে নদীর জল উদ্দাম বেগে বহে চলেছে। শেষকিরণও দাঁড় টানায় যোগ দেয়। সবাই মিলে "জয় গঙ্গামায়ীকি!" বোল ছেড়ে শরীর সামনে ঝুঁকে, আবার একসঙ্গে হেঁচ্‌কা টান দিয়ে পিছনে চিতিয়ে, দাঁড় টানে। বজরাও কোনমতে হাত খানেক এগিয়ে গিয়েই তখনি আবার পিছিয়ে আসে। উন্মাদিনী জাহ্নবী যেন সহস্র তরঙ্গের বাহু তুলে ফেরত পাঠান। আধঘণ্টা চেষ্টা করেও দাঁড় টেনে দু হাতও এগুনো যায় না। অথচ, দেখা যায় কিছু দূরে, এই প্রবল স্রোতধারার ওদিকে, ছোট নৌকাগুলি জল কেটে কেমন অনায়াসে এগিয়ে যায়। আমাদের মাঝিরাও বজরা ঘুরিয়ে পিছিয়ে এসে নদীর সেইদিক পানে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু, সেখানে যেতেও এই খরস্রোত অতিক্রম না করে উপায় নেই,—তাই পেছিয়ে এসেও আবার একই দুর্দশায় পড়া। তখন চেষ্টা হয় দাঁড় টানা ও সেইসঙ্গে জলের মধ্যে লম্বা লগি দিয়েও ঠেলা। তাতে সামান্য এগুনোও হয়। কিন্তু হাত পিছলে লগি পড়ে গেল জলে ;—জলে পড়ে থাকাও নয়, স্রোতের টানে ভেসে চলে তীরবেগে! দুজন মাঝিও তখনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সাঁতরে যায়, লগি উদ্ধার করে আনে।

লগি ও দাঁড়ের সাহায্যে এগুনোর অল্প আশা দেখায়, দাঁড় টানার মাঝে মাঝে দম্ নেবার জন্যে বদরী আরও এক পন্থা অবলম্বন করে। এক এক দমে যতোটুকু এগুনো যায়, সেইখানে পৌঁছেই নোঙর ফেলা, একটু বিশ্রাম, তারপর নোঙর তুলে আবার দাঁড় ও লগির সাহায্যে অল্প এগুনো। আবার নোঙর,—একটু দম নেওয়া। এইভাবে দীর্ঘ সময় নিলেও কিছুদূর আগানো হয়। কিন্তু, হঠাৎ আবার আর এক বিভ্রাট। মাঝিদের চিৎকার,—'গিরাবি গির্ গেইল,' 'গিরাবি গির্ গেইল'!

কী ব্যাপার? শেষকিরণ বলে, নোঙর ছিঁড়ে জলে পড়ে গেছে! কী কাণ্ড!

তবে? তবে আর কী! দুজন মাঝি আবার তখনি জলে ঝাঁপ দেয়। ডুবে সেই নোঙর উদ্ধার করে তোলে।

অবাক হয়ে দেখতে থাকি,—এরা যেন জলের মাছ!

এইভাবেই ঘণ্টা তিনেক কেটে যায়, তবুও টন্‌স্ ও গঙ্গার সঙ্গমের নিকটে সেই খরস্রোত পার হওয়া সম্ভব হয় না। ভাগ্যক্রমে কাশীর আর একটা বজরা সেই স্রোতের অপর দিকে পৌঁছায়। তার মাঝিরা আমাদের দুর্দশা দেখে তাদের বজরা নোঙর করে। কয়জন সাঁতার কেটে চলে আসে আমাদের বজরায়। দল বেঁধে দাঁড় টেনে, লগি ঠেলে, অতি কষ্টে বজরা নিয়ে যায় অপর দিকে। মাঝিরা হাঁফ ছাড়ে। বজরাও এখন সহজ গতিতে মাঝনদী পানে এগিয়ে চলে।

কিন্তু, ওদিকে বেলাও শেষ হয়ে আসে। সন্ধ্যা নামে, মাইল দুই যেতে না যেতেই রাত্রি হয়। একটা চরের নিকট বজরা নোঙর করে। অপর বজরা কয়টি এসেও যোগ দেয়।

আজ চাঁদও ওঠে একটু দেরীতে।

আজ আর মাঝিদের গানবাজনা নেই। "জ্যোৎস্নাসুপ্ত নিশীথের নিস্তব্ধ প্রহর।"

॥ পনেরো ॥

সকালে আবার যাত্রা। যত এগিয়ে যাওয়া হয় নদীর বিস্তৃতিও তত বাড়ে।

মাঝে মাঝেই শুশুক দেখা যায়। ভু-উ-স্ করে ভেসে উঠেই নিমেষে পাক খেয়ে আবার জলের তলায় অন্তর্ধান করে।

শেষকিরণ আর এক দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে ওঠে, ওধারে ওটা আবার কী? ঐ দূরে চরের ওপর? কুমীর শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে নাকি?

তাকিয়ে দেখি। অনেকখানি দূরে। সঠিক বোঝা যায় না। বলি, হতে পারে। বিশপ হেবর কুমীর দেখেছিলেন এ-সব অঞ্চলের গঙ্গায়।

শেষকিরণ বলে, কুমীর এখনও হয়ত থাকে এখানে।—তারপর কী যেন ভেবে প্রশ্ন করে, আচ্ছা, পৌরাণিক সেই মকর—গঙ্গাদেবীর বাহন —বোধ হয় একালের কুমীর? নয়?

বলি, জানি না। তবে, একটা আশ্চর্য ঘটনা শুনেছিলাম কাশীতে আমার বিশেষ পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়িতে,—তাঁর স্ত্রীর মুখে। সেবার কাশীতে ছিলাম তাঁদেরই কাছে। ভদ্রলোক ছিলেন অতি সজ্জন, সাধু প্রকৃতির। স্ত্রীও তেমনি তাঁর উপযুক্তা সহধর্মিণী। তাঁদের দুজনেরই কাশীতেই কয়পুরুষের বাস। ভদ্রলোক একসময়ে ওকালতি করতেন, তারপর বয়স হলে আর কোর্টে যেতেন না। ধর্মচর্চায় দিন কাটাতেন। তাঁর স্ত্রী একদিন কথায় কথায় তাঁর বাল্যজীবনের সেই অদ্ভুত ঘটনাটি বলেন। তিনিও ছিলেন কাশীর মেয়ে, আজন্ম কাশীতে বাস। তাঁর ঠাকুমা নিত্য গঙ্গাস্নানে যেতেন পাড়ার বৃদ্ধাদের সঙ্গে। তিনিও প্রায়ই তাঁদের সঙ্গে থাকতেন, গঙ্গার ঘাটে তাঁদের কাপড়চোপড় আগলে বসে থাকতেন,

বৃদ্ধারা স্নানে নামতেন। সেদিনও বুড়িরা ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নেমে স্নান করছেন, আর তিনি—ছোট্ট মেয়ে পাশেই ঘাটের থাম্বার ধারে জলের ওপর ঝুলে-থাকা পাণ্ডাদের কাঠের পাটাতনে তাঁদের কাপড় নিয়ে বসে। হঠাৎ সেই তক্তা ভেঙে গঙ্গার মধ্যে পড়ে গেল। তিনিও জলের ভেতর তলিয়ে গেলেন। বুড়িদের আর্তনাদ, চারদিকে হইচই। মাঝিরা, পাণ্ডারা কাছে যারা ছিল, জলে তখনি নেমে তল্লাশ করতে থাকে। কিন্তু অনেক খোঁজা-খুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায় না। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, ঘাট থেকে একটু দূরে জলের ওপর ভেসে-ওঠা তার ছোট্ট দেহ। তখনি দুজন সাঁতরে গিয়ে তাকে পাড়ে এনে তোলে। চারদিকে ভিড় জমে গেছে। বাড়ির বৃদ্ধারা কাঁদছেন। তিনি অবশ্য অচৈতন্য। পাণ্ডাদের চেষ্টায় অব-শেষে তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। চোখ তাকিয়ে দেখতে থাকেন। বৃদ্ধাদের অশ্রুসিক্ত মুখে হাসি ফোটে। ঠাকুমা সজল চোখে আদর করে জড়িয়ে ধরে বলেন, দুষ্টু মেয়ে, কোথায় চলে গিছ্‌লি রে?—আর সেই ছোট্ট মেয়ে তখন তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা শোনায়,—আমি তো জলের মধ্যে দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলাম, এমন সময় প্রতিমার মত সুন্দর এক মেয়ে—কী চমৎকার তাঁর গয়নাগাঁটি, কাপড়চোপড়!—একটা কুমীরের পিঠে বসে জলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, ওমা! ওইটুকু মেয়ে! তুই কোথায় ভেসে চল্‌লি? আয়, আয়,—বলে কোলে তুলে নিয়ে জলের ওপর তুলে দিলেন!—কী সুন্দর দেখতে তাঁকে!

শেষকিরণ অবাক হয়ে শোনে, আমিও যেমন একদিন আশ্চর্য হয়ে সেই মহিলার মুখে সে কাহিনী শুনেছিলাম।

দুপুরে আবার আজ এক বিশাল চরের ধারে স্নান আহার বিশ্রাম। বিকালে আবার যাত্রা। গঙ্গার বামকূলের কিছুদূরে রাত্রের জন্য নোঙর করা।

আগামী কাল আমরা প্রয়াগে পৌছুব।

॥ ষোল ॥

পরদিন সকালে যাত্রা করে বজরা চলে আসে গঙ্গার দক্ষিণ উপকূলের নিকটে।

আমরা দুজনে ছাদে রোদে বসে। ধীরে ধীরে বজরা চলে। নদীতীরে গ্রামের পর গ্রাম আসে। পিছনে ফেলে বজরা এগিয়ে যায়।

নদীর সেই তীরের দিকে তাকিয়ে শেষকিরণ কী যেন ভাবতে থাকে, দেখি।

জিজ্ঞাসা করি, একমনে ভাবছ কী অতো? আজই তো ওবেলায় প্রয়াগে পৌঁছে যাব। মাঝিরা আশা করেছিল দশ দিনেই চলে আসবে, কিন্তু মির্জাপুরে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আটকে থাকা, আবার টন্‌স্‌ নদীর সঙ্গমের কাছে স্রোতের মুখে পড়ে কয়েক ঘণ্টা নষ্ট হওয়া,—একদিন তাই বেশি সময় লেগে গেল।

শেষকিরণ বলে, তা লাগুক। সেই কথাই ভাবছি। এভাবে এতো-খানি পথ নৌকায় আসা,—এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। আপনি 'নষ্ট হওয়া' বললেন, কিন্তু সেই উত্তেজনার মধ্যেও আনন্দ লাভ হোল কম? কী চমৎকার দিনগুলি কাটল! দিন রাত নৌকার মধ্যে বাস,—অথচ, এক মুহূর্তও একঘেয়ে মনে হয় নি, বন্দী বা আবদ্ধ ভাবও জাগে নি। মনেই হয়নি, জনজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে আছি। গঙ্গার বুকে, গঙ্গার দুই কূলে প্রাণ ভরে প্রাকৃতিক শোভা দেখা,—সে তো আছেই, তা'ছাড়া, যেমন সমগ্র দৃষ্টিতে নদী দেখায় স্থির, অথচ নদীর স্রোতের বিরাম নেই, জল আসছে, যাচ্ছে—চলেছে, চলেছেই—নিরন্তর চলেছে, তেমনি নৌকা-যাত্রীরও হাঁটা নেই, চলা নেই—নৌকায় বসে বসে আসা,—তবুও গঙ্গার

দু-কূলে মানুষের জীবনধারার যে অবিচ্ছিন্ন উৎসব চলেছে,—তাই দেখতে দেখতে আসা,—কতো ভাল লাগে! মানুষকে দূর থেকে দেখেও যেন কাছে পাওয়া, আবার তাকে পিছনে ফেলে আসা,—নতুন করে আর কাউকে পাওয়া—তাকেও আবার হারিয়ে ফেলা। তাই বসে বসে ভাবছি, নদীর বুকেও যেমন জলের প্রবাহ, নদীর কূলেও তেমনি জীবন-প্রবাহ, নৌকার মধ্যে বসে-থাকা যাত্রীর মনেও তেমনি ভাবের প্রবাহ! এ ক'দিন এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ হোল।

তার কথাগুলি শুনে আমার ভাল লাগে।

বলি, খুব সত্যি। আমার এ ক'দিন আরও একটা কথা কী মনে হচ্ছিল শুনবে? হিমালয়ে পায়ে হেঁটে ঘোরা, আর গঙ্গার বুকে এই জলযাত্রা,—দুই অভিযানেরই মনের ওপর আশ্চর্য প্রভাব। দুই যাত্রাতেই আনন্দ অপরিসীম। কিন্তু, সে আনন্দের রূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তার কারণও যথেষ্ট। হিমালয় অচল। ধীর। গম্ভীর। হিমালয়ের বিরাট মৌন মহিমা। সেই বিরাটত্ব দেখে মনে বৈরাগ্য জাগে। নিজেকে কতো ক্ষুদ্র মনে হয়। হিমালয়ের কতো বিচিত্র ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য। কখনো আলোয় ঝল্‌মল্‌ আকাশস্পর্শী তুষারশিখর। আবার কোথাও পাতালমুখী ঘোর অন্ধকারময় উপত্যকা। কখনো বা চারিপাশে নির্জন গহন অরণ্য। কতো নৃত্যপরা নির্ঝরিণী। পাহাড়ের বুকে আঁচড়-কাটা আঁকা-বাঁকা পথরেখা,—কেবলি মন টানে পথ চলতে, সুদূর গিরিশিখর যেন কাছে যেতে ডাক দেয়—

শেষকিরণের মুখে হাসি ফোটে। বলে, এ তো আমারই মনের কথা বলছেন।

আমি বলি, তা জানি বলেই তো বলছি। আর, এইসব কারণেই ত হিমালয়কে মনে হয় যেন পিতৃসম। আর, অপর দিকে এই গঙ্গার বুকে জলযাত্রায়? নদী,—ধীর। প্রশান্ত। গতিময়। অথচ, স্নিগ্ধ মূর্তি। কবির ভাষায়,—'বিগলিত করুণা'। এখানে পায়ে চলার উন্মাদনা জাগায় না। স্থির হয়ে বসে প্রকৃতির ও দুই তীরের দৃশ্য দেখা,—আপন মনের গহনে ডুবে

থাকা। মহাভারতে নদীকে বলা হয়েছে,—"বিশ্বস্য মাতরঃ"। নদী মাত্রেই বিশ্বের জননী। নদী প্রকৃতই মাতৃস্বরূপা;—স্মিত-বদনা, স্নেহময়ী জননী। মায়ের আঁচল ধরে সন্তানের চলার মতন—নদীর কোলে, নদীর তীরে মানুষের ঘন বসতি,—সমাজসভ্যতারও পত্তন। নদীর ধারে শুধু কৃষিবাণিজ্যেরই বিকাশ হয় না, কাব্য, ধর্ম, শৌর্য, ভক্তি—এককথায় সংস্কৃতিরও বিকাশ। জগতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনায় নদীর কতো গভীর প্রভাব। সামাজিক ইতিহাসে, লোকগাথায়, সাহিত্যে, সঙ্গীতে নদীর স্থান,—নদীর স্তবস্তুতি।

শেষকিরণ উৎসাহিত হয়। বলে, শুধু এদেশেই নয়, জগতের সর্বত্রই এই প্রাধান্য ও প্রশস্তি। নদীর ধারেই তো কতো প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ, আবার কালক্রমে বিলোপও। তারপর, আবার নতুন সভ্যতার পত্তনও।—মিশরের নীলনদ, পশ্চিম এশিয়ায় ইউফ্রেটিস্-টাইগ্রিস্, বা এশিয়ার ভল্‌গা, ডন্, ইউরোপের ডানিউব, উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি, মিসৌরী, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন, আফ্রিকার কঙ্গো, চীনের ইয়াং-সিকিয়াং, হোয়াংহো, বর্মার ইরাবতী,—এমন কি ইংলণ্ডের ছোট্ট নদী টেম্‌স্,—কতো বলব? জগৎ জুড়ে সর্বত্রই নদীই যেন সে-দেশের জীবন। আর, আমাদের সিন্ধু, শতদ্রু, গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী, কাবেরী, নর্মদা—সারা ভারতের সর্বত্রই নদনদী ছড়িয়ে।

আমি চুপ করে তার মনের উচ্ছ্বাস শুনি। সে ক্ষণিক থেমে মন্তব্য করে, তবে, নদীর মধ্যে আমাদের চোখে এই গঙ্গা-ই হলো সর্বপ্রধান।

তার মতে সায় দিয়ে বলি, এ তো তুমি গীতার কথাই বললে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, "স্রোতসামস্মি জাহ্নবী"। আর, পুরাণে বলে, গঙ্গা শুধু পৃথিবীতে নয়, স্বর্গেও প্রবাহিতা, পাতালেও বয়ে চলেছেন। নামও তাই ত্রিপথগা। রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে, প্রাচীন মহাকবিদের কাব্যে মা গঙ্গাকে নিয়ে কতো স্তব, কতো স্তোত্র, কতো কাহিনী রচিত হয়েছে।

শেষকিরণ বলে, কেন ? বিভিন্ন ভাষাতেও কতো গান, লোকগীতিও লেখা হয়েছে। তা ছাড়া, আমাদের বাঙলা সাহিত্যেও—এই দেখুন না, —বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী, ইন্দিরা, রজনী প্রভৃতি উপন্যাসে নদ-নদীর কতো নিবিড় সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের অনেক-গুলিরই পরিবেশ নদী অঞ্চল, তার, মানুষ, তার সমাজ,—যেমন, মেঘ ও রৌদ্র, একরাত্রি, সমাপ্তি, অতিথি, নিশীথে,—আর গঙ্গার শোভার বর্ণনা তো তাঁর বেশ কয়েকটি রচনাতেই। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝির কথাও মনে পড়ছে। আমার আশ্চর্য লাগে, আমাদের সাহিত্যে হিমালয় কিন্তু অমন স্থান পান নি। অথচ, দেখুন, কালিদাসের কাব্যে নদীর চেয়ে হিমালয়ের কী অপূর্ব বর্ণনা ! আমরা কি তারপর এ-যুগে হিমালয় থেকে দূরে সরে এলাম ? কেন ? কী জানি ! একি পিতার রাজ-সভা থেকে পালিয়ে এসে মায়ের কোলে আশ্রয় ?

তার চিন্তাধারায় আমারও কৌতূহল জাগে। বলি, হয়ত এর এক প্রধান কারণ, জগতে,—এইমাত্রই কথা হচ্ছিল—সমাজ ও সভ্যতার পত্তন ও বিকাশ প্রায় সর্বত্রই নদীকে কেন্দ্র করে। আর, মানুষের জীবনধারণে জল অপরিহার্য। জীবন শব্দের এক অর্থও হোল জল। যন্ত্রযান আবি-ষ্কারের আগে স্থলপথের চেয়ে জলপথই ছিল দূর দেশে যাতায়াতের ও ব্যবসাবাণিজ্য চালানোর সহজতর উপায়,—প্রকৃতির দান। তাই, মানুষের জীবন নদীর সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়েও থাকে। হিমালয়ের সঙ্গে সেই নিবিড় সম্পর্কের সুযোগ হয় না। সেখানেও দেখা যায় ভাগীরথীর ধারে কতো পাহাড়ী গ্রাম, তীর্থক্ষেত্র।

তারপর গঙ্গার তীরের দিকে তাকিয়ে বলি, এখানেও দেখ, বড় শহর এলাহাবাদ যত নিকটে আসছে নদীর ধারে কতো ঘন ঘন গ্রাম দেখা দিচ্ছে। নদীর বুকেও নৌকার সংখ্যাও বাড়ছে। অনেকেই চলেছে উজান বেয়ে প্রয়াগের দিকে। নদীর স্রোতও বেড়েছে, প্রয়াগে যমুনার সঙ্গে সঙ্গমের ফলে। গঙ্গার বিস্তৃতিও কতো বিশাল হয়ে এসেছে !

শেষকিরণ বলে, শুধু তাই? দেখুন না, নদীর বুকে স্রোতের মাঝে লম্বালম্বি কতো মাছধরার জাল পোঁতা! বজরা চালাতে হচ্ছে সেইসব এড়িয়ে।

এইভাবেই আমাদের আলোচনা ও কথাবার্তায় সকাল কেটে যায়। বজরাও এগিয়ে চলে।

দুপুরে মাঝিরা আজ অল্পক্ষণই বিশ্রাম নেয়।

বিকালে দূরে প্রয়াগে গঙ্গার তীরে ঝুঁসির উঁচু পাড় ও টিলার উপর সবুজ গাছপালা যেন যাত্রাশেষের সঙ্কেত জানায়। অপর দিকে সঙ্গমের উপর এলাহাবাদ দুর্গের প্রাকারও ক্রমে নিকটবর্তী হতে থাকে।

গঙ্গা-যমুনার মিলিত ধারার প্রবল প্রবাহের উজানে মাঝিরা সজোরে দাঁড় টেনে এগিয়ে চলে। যাত্রা সাঙ্গ করার আগ্রহে উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

দূরে সামনে ডানদিকে গঙ্গার প্রবাহ অনেকখানি চোখে পড়ে। কিন্তু, বাঁদিক থেকে বেঁকে আসা যমুনাকে অল্পই দেখা যায়। যেন নদী-তীরের আড়ালেথাকা যমুনার নীলাম্বরী বসনের শেষপ্রান্ত।

দুই নদীর সঙ্গমের দিকে তাকিয়ে মনে আসে, কোথায় সুদূর হিমালয়ের সেই তুষার-রাজ্যে দেখে-আসা ঐ নদী দুটির উৎস মুখ! গঙ্গার গোমুখে। যমুনার যমুনোত্রীতে। দুই নদীর উৎপত্তি,—তেমন কিছু দূরে নয়। মাঝখানে মাথা তুলে মাত্র কয়েকটি গিরিশ্রেণী,—অবশ্য দুরতিক্রম্য। যেন, একই পিতার সন্তান,—দুই সহোদরা ভগিনী। কিন্তু, পিতৃগৃহে দুজনের সাক্ষাৎ হয় না। হিমালয়ের পাদদেশে সমতলে কাছাকাছি নেমে এসেও উভয়ের মিলন ঘটে না। দুই ভগিনী জন্মাবধি বিচ্ছিন্নই থাকে। অথচ, মনে যেন মিলনের আকুল আগ্রহ। অবশেষে বহু দেশ

অতিক্রম করে সেই মিলন হয়—এই এলাহাবাদে, গুপ্তস্রোতে সরস্বতীও যোগ দেন,—সেই শুভসঙ্গমে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রয়াগতীর্থ—যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের পবিত্রতম স্থান।

দুই নদীরই স্রোত-স্মৃতি-মালায় গাঁথা পুরাণ ও ইতিহাসের কতো বিচিত্র বিভিন্ন কাহিনী।

যমুনার জলপ্রবাহে প্রতিবিম্বিত হয়েছে কুরুপাণ্ডব থেকে শুরু করে মোগল সাম্রাজ্যের কতো স্মৃতিচিত্র। যমুনা দেখেছেন কতো সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, আবার নূতন রাজধানী পত্তন। ঐ কালিন্দীরই কূলে—মথুরা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও লীলাভূমি। আবার, তারই তীরে এখনও উজ্জ্বল, শাজাহানের "এক বিন্দু নয়নের জল / কালের কপোলতলে শুভ্র-সমুজ্জ্বল"—তাজমহল।

আর, ভাগীরথী?

তাঁর তীরে বাল্মীকির তপোবন। মুনিঋষিদের আশ্রম। মঠ, মন্দির। গঙ্গা,—দেবব্রত ভীষ্মের জননী। আর্যজাতির মাতা। তাঁরও তীরে স্থাপিত হয়েছে তাঁদের বড় বড় সাম্রাজ্য। কুরুপাঞ্চাল দেশের সঙ্গে অঙ্গবঙ্গাদি প্রদেশের যোগস্থাপন গঙ্গার প্রবাহ অবলম্বনে।

কিন্তু, দুই নদীর শোভা আজন্ম স্বতন্ত্র। মাহাত্ম্যও পৃথক। জলধারারও রূপের প্রভেদ।

গঙ্গা শুভ্রমূর্তি। গৈরিকবসনা। যেন, তপস্বীকন্যা।

আর, যমুনা শ্যামাঙ্গিনী রাজকন্যা। যমরাজের ভগিনী।

বজরায় বসে দূর থেকে যমুনার সেই নীল জলের ও গঙ্গার শ্বেতাভ প্রবাহের সঙ্গম সুস্পষ্ট দেখা যায়। দুই ভগিনী বহু দেশ ঘুরে এতোদিনে মিলিত হয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হন্। পরস্পর পাশাপাশি,—যেন হাত ধরাধরি করেই, ছুটে চলেন। কিন্তু, তখনও যমুনা যেন নিজস্ব নীলাম্বরী বসন ত্যাগে কুণ্ঠিতা। তাই বুঝি দেখি, মিলনের পরও গঙ্গার বুকেও কোথাও কোথাও নীলের আভা ছড়ানো। দুই নদীর স্রোতে স্রোতে

মেলামেশা। কোথাও নীল, কোথাও সাদা।

গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে দুই রঙের এ এক অপরূপ মিলনখেলা।

মনে পড়ে, মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশে এই সঙ্গমের অপূর্ব বর্ণনা।

রামচন্দ্র সীতাদেবীকে উদ্ধার করে লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় ফিরে চলেছেন। পুষ্পক রথে। পথে বিভিন্ন স্থানে কোথায় কি ঘটেছিল সীতাকে তিনি তার বর্ণনা দেন। আকাশপথে রথ এগিয়ে আসে। চিত্রকূট ছাড়িয়ে পৌঁছায় প্রয়াগের উপর। এখানে ভরদ্বাজ আশ্রম।

আদিকবি বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে এই সঙ্গমের বর্ণনায় শুধু "চিত্রকাননা" "রম্যা" যমুনা ও "ত্রিপথগা" "পুণ্যা" গঙ্গার উল্লেখ করেন, সঙ্গমের রূপ-বর্ণনায় বিরত থাকেন।

"...এষা সা যমুনা রম্যা দৃশ্যতে চিত্রকাননা
ভরদ্বাজাশ্রমঃ শ্রীমান্দৃশ্যতে চৈষ মৈথিলী।
ইয়ং চ দৃশ্যতে গঙ্গা পুণ্যা ত্রিপথগা নদী..."

কিন্তু, মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে সেই একই দৃশ্যের কাব্যময় বিবরণে উপমার নানা রঙের পাত্র সাজিয়ে সঙ্গমের পূর্ণচিত্রটি ফুটিয়ে তোলেন।

গঙ্গার শ্বেতাভ স্রোতের সঙ্গে সুনীল যমুনাতরঙ্গের মিলন-সৌন্দর্য দেখিয়ে রামচন্দ্র সীতাকে বলেন, দেখ, ঐখানে মনে হচ্ছে মুক্তামালায় গাঁথা নীলকান্তমণি যেন মোতির প্রভাকে কিছুটা ম্লান করে দিচ্ছে, আবার, ঐদিকে যেন শ্বেতপদ্ম ও নীলপদ্মের মালা গাঁথা। ঐ ওখানে আবার, যেন মানসযাত্রী শ্বেতহংস দলের সঙ্গে শ্যামপক্ষ কলহংসও উড়ে চলে। ঐ—ঐ ওদিকে আবার দেখাচ্ছে, যেন শ্বেতচন্দনচর্চিত পটে কৃষ্ণচন্দনের আল্‌পনা আঁকা। ওধারে দেখ, যেন শুভ্রজ্যোৎস্না-স্নাত আকাশে কয়টা কালোমেঘের ছায়া, আবার ঐদিকে যেন নীল আকাশের বুকে শরতের সাদামেঘের ভেলা,—আর, এদিকে তাকাও,—ওখানে যেন মহাদেবের শ্বেতভস্ম বিভূষিত অঙ্গে কৃষ্ণভুজঙ্গের ভূষণ!—এই সঙ্গমে পুণ্য-

স্নানে তত্ত্বজ্ঞানহীন মানুষেরও আর পুনর্জন্ম হয় না।

বজরায় বসে সেই মহাকবি-বর্ণিত সঙ্গমের অপূর্ব রূপ আজ বিমুগ্ধ নয়নে দেখতে থাকি। মনে গুঞ্জরিত হতে থাকে:

"ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈর্মুক্তামযী যষ্টিরিবাণুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালা সিতপঙ্কজানামিন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব॥
ক্বচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাং কাদম্বসংসর্গবতীব পঙ্‌ক্তিঃ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা ভক্তির্ভুবশ্চন্দনকল্পিতেব॥
ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভিশ্ছায়া বিলীনৈঃ শবলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্রলেখা রন্ধ্রেষ্বিবালক্ষ্যনভঃ প্রদেশা॥
ক্বচিৎ চ কৃষ্ণোরগভূষণেব ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি বিভাতি গঙ্গা ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ॥
সমুদ্রপত্ন্যোর্জলসংনিপাতে পূতাত্মনামত্র কিলাভিষেকাৎ।
তত্ত্বাববোধেন বিনাপি ভূয়স্তনুত্যজাং নাস্তি শরীরবন্ধঃ॥"

বজরা নদীর দক্ষিণ তীরের নিকট দিয়ে এগিয়ে যায়। বাঁদিক থেকে আসা যমুনার নীলধারা ধরে। দেখতে দেখতে বাঁক ঘুরে, যমুনার বক্ষে প্রবেশ করে। নদীর অপর পারে পাড়ি দিয়ে দুর্গের নিচে—সঙ্গমের অদূরে—যমুনার সরস্বতীঘাটে অপর নৌকা ও বজরার মাঝে নোঙর ফেলে।

সে-রাত্রি বজরাতেই কাটে। পরদিন—১১ই জানুয়ারি—সকালে আবশ্যকমত মাল পত্র নিয়ে তীরে ওঠা। সঙ্গমে ঝুঁসিচরে কালীকমলী পঞ্চায়েত ক্ষেত্রের কুম্ভমেলার তাঁবুতে এগার দিন কাটে। ২২শে জানুয়ারি সকালে আবার বজরায় এসে ওঠা।

সেইদিনই আবার গঙ্গাতরঙ্গে বারাণসী যাত্রা। ২৭শে সন্ধ্যায় কাশী পৌঁছানো।

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

হিমালয়ের পথে পথে

মণিমহেশ

কুয়ারী গিরিপথে

গুপ্তেশ্বর

আফ্রিদী মুল্লুকে

ত্রিলোকনাথের পথে

পালামৌর জঙ্গলে

কৈলাশ ও মানস সরোবর

গঙ্গাবতরণ

বৈষ্ণোদেবী ও অন্যান্য কাহিনী

কাবেরী কাহিনী

শেরপাদের দেশে

পঞ্চকেদার

মুক্তিনাথ

আলোছায়ার পথে

অ্যালবাম

দুই দিগন্ত
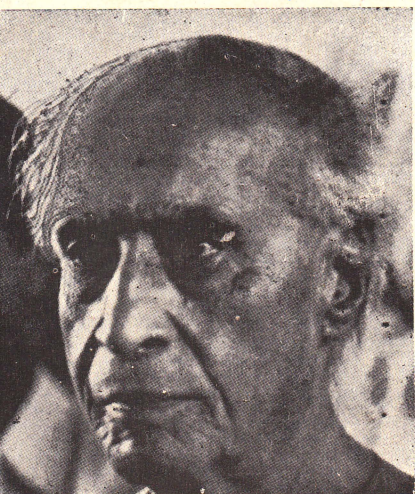
উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণকাহিনী বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের এক বড় সম্পদ। গহন পর্বতের আড়ালে লুকিয়ে থাকা নৈসর্গিক সৌন্দর্য, চিরপরিচিত নদীর অজানা উৎসস্থল, অজানা জনপদ ও সেখানকার মানুষের সহজ সরল জীবন-যাত্রা, অজানা অরণ্য এবং আরণ্য সৌন্দর্য ও আরণ্য সমাজের বিবরণ, নানা অজানা মন্দির ও সাধুর কথা, বিপদসংকুল যাত্রা-পথের ভয়াল শান্ত আকর্ষণ—এসবই আমরা জানতে পারি ও উপলব্ধি করি তাঁর বিভিন্ন ভ্রমণকাহিনী পড়ে। যে জায়গায় আমরা যেতে পারি না সেখানে তিনি নিয়ে যান যেন আমাদের হাত ধরে। তবে এই গ্রন্থে তিনি এমনই এক ভ্রমণের বিবরণ দিয়েছেন যা ছিল পাঠকের সকল কল্পনার বাইরে। একদা ঘটনাচক্রে বেশ কিছুদিন কাশীর গঙ্গা-বক্ষে বজরায় বাস করার সুযোগ মিলে যায় তাঁর। সেই বজরা-বাসের বিবরণও কম চমকপ্রদ নয়। সেই সময়ই তিনি শোনেন, প্রয়াগে কুম্ভের সময় কাশী থেকে অনেক বজরা যায় প্রয়াগে। প্রয়াগে কাশীর মত এত বজরা নেই। বজরার মালিকরা খালি বজরা প্রয়াগে পাঠিয়ে দেন কুম্ভ-স্নানার্থীদের কাছে ভাড়া খাটানোর জন্য। যোগাযোগ ঘটে গেল। একদিন এইরকম এক খালি বজরায় যাত্রা করলেন উমাপ্রসাদ, সঙ্গী হলেন বহু দুর্গম পথের সহযাত্রী শেষকিরণ। বহু পরিশ্রম, আতঙ্ক, রোমাঞ্চকর ঘটনা, কৌতুককর পরিস্থিতি এই সব অতিক্রম করে কিভাবে তাঁরা পৌঁছলেন প্রয়াগে—এই গ্রন্থ সেই চমকপ্রদ ভ্রমণের জীবন্ত চলচ্ছবি। এই অদ্ভুত—সাধারণের অকল্পিত ভ্রমণ বিবরণ পড়ে মনে হবে লেখকের আগের সমস্ত ভ্রমণকাহিনীকে অতিক্রম করে গেছে তাঁর এই বিচিত্র রসসিক্ত নবতম ভ্রমণকাহিনী-**জলযাত্রা**।